৩৭ বর্ষ • ৪র্থ সংখ্যা • অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি	আশীষ লাহিড়ী	৩
দক্ষিণবঙ্গের বন্যা	তপোব্রত সান্যাল	৭
ডাক্তার ভালো-মন্দ	ইন্দ্রনীল ঠাকুর	১২
বাংলার হারানো ধান	নন্দগোপাল পাত্র	১৫
পড়াশোনা দেখাশোনা	সুগত সিংহ	১৬
তিন দশকে নর্মদা বাঁচাও	অরুণ পাল	২০
গৌরী লঙ্কেশ	পূরবী ঘোষ	২২
বিপন্ন শঙ্খশিল্প	অলোককুমার বিশ্বাস	২৩
সাঁওতালি ভাষা	অনুরূপা মুখোপাধ্যায়	২৮
চিঠিপত্র, সংগঠন সংবাদ		৩১

সম্পাদক
সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬
ফোনঙ্গ ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৬৫
ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com
ই মেল: utsamanush1980@gmail.com

সম্পাদকীয়

কবি কালিদাস রায় 'চাঁদ সদাগর' কবিতায় একটা মোক্ষম কথা লিখেছিলেন–

শিখাইলে এই সত্য, তুচ্ছ নয় মনুষ্যত্ব;
দেব নয়, মানুষই অমর;
মানুষই দেবতা গড়ে, তাহারই কৃপার 'পরে
করে দেব মহিমা নির্ভর।

আমরা আমাদের আদলে দেবদেবী গড়েছি। তাদের ওপর মনুষ্যোচিত রাগ-ভালবাসা অর্পণ করেছি। তাদের সঙ্গে মা, বাবা, সন্তান, এমনকি প্রেমিকের মান-অভিমানের সম্পর্ক পাতিয়েছি। কাউকে দিয়েছি শিক্ষা, কাউকে অর্থ বা সামরিক দপ্তর। স্তুতিতে পণ্ডিতরা মন্ত্র তৈরি করেছেন, ভক্তেরা বেঁধেছেন গান। দুর্গাপুজো তেমনই এক পুজো। এখানে দুর্গা মায়ের চরিত্রে। ছেলেপুলেদের নিয়ে ফি বছর কৈলাসের শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপেরবাড়ি আসেন। চারদিন কাটিয়ে ফিরে যান। এক চমৎকার সমাজচিত্র ধরা আছে পুজো-কাহিনীতে। অসাধারণ সব উপাখ্যান আর গান তৈরি হয়েছে একে ঘিরে। খরচসাপেক্ষ বলেই এই দুর্গাপুজো করত বর্ধিষ্ণু পরিবার। পরে তা পাঁচভূতের খপ্পরে পড়ল। তাতেও প্রথম দিকে ছিল নিষ্ঠা, আন্তরিকতা। সার্বজনীন সামাজিক উৎসবই ছিল। ক্রমে তাতে ঢুকে পড়ল বাণিজ্য। ফল যা হওয়ার তাই। বিশেষত শহর কলকাতায়। এ নিয়ে সবিস্তার যাওয়ার দরকার নেই, ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তথাকথিত শাস্ত্রের তোয়াক্কা কোনো পুজো কমিটিই করে না। খুঁটিপুজো নামে এক নতুন ফ্যাশন চালু হয়েছে। কী মন্ত্রে খুঁটিপুজো হয় কে জানে!

কমিউনিস্টরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। রাজ্যে তাঁরা ক্ষমতায় আসায় আশা জেগেছিল, সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হবে। সাধারণ মানুষকে যুক্তি-সচেতন করা হবে। হল না। উল্টে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পুজো-সংস্কৃতির দাপট এবং রমরমা বাড়ল। এখন তৃণ-গুণে তা বহুগুণে ক্রমবর্ধমান। প্রতি বছর বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢালিয়ের সংখ্যা বাড়ছে। ভোলে বাবার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীও তৈরি হয়ে গিয়েছে। ধর্মপ্রাণতার হদ্দমুদ্দ করে দিয়েও নিজেদের বা এই পোড়ারাজ্যের যে বিশেষ কিছু উন্নতি হচ্ছে, এমন

তো চোখে পড়ছে না। মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপে প্রযুক্তি-আধুনিক হয়ে উঠেছি। আরেকদিকে আশারাম, রামরহিমদের চরণের সেবা লাগিও হয়ে উঠছি। এ পথের শেষ কোথায় কে জানে!

এর উল্টোদিকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গুঁতোও সামলানো দায় হয়ে উঠেছে। চমৎকারিত্ব দেখানোর আতিশয্যে যথেচ্ছভাবে প্রাকৃতিক নিয়মনীতি ভাঙার খেসারত শেষমেশ নিজেদের ধ্বংস দিয়ে দিতে হবে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে। আরও ফলনের জন্য কৃষিজমিতে রাসায়নিকের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। সেই বিষ আমাদের শরীরে ঢুকে যা ক্ষতি করার তো করছে, এবার তো কৃষকেরা নিজেরাই মারা পড়ছেন, তা ব্যবহার করতে গিয়ে। মহারাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যাটা ৩৫। এর বাইরে এর প্রভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে-চলাদের সংখ্যাটা জানি না। ডিডিটি থেকে বোরো চাষ– নানা চমৎকারিত্ব দেখিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা কৃতিত্ব জাহির করেছেন। পরে দেখা গিয়েছে, তাৎক্ষণিক লাভ আসলে হিতে বিপরীত। কৃষিকাজকে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ ছোট কাজ বলেই দেখিয়ে এসেছে। কৃষক সন্তান তাই লেখাপড়া শিখেই ছুটে আসে শহরে চাকরি করতে। সুট-বুট পরে ভদ্রলোক হতে! কৃষক জমি বেচে গাড়ি কারখানায় পিয়নের চাকরি করে ধন্য হতে চেয়েছে, কয়েকদিন আগের উদাহরণ। সিকিমে গিয়ে জানলাম, ওঁরা চাষের কাজে এক ফোঁটা রাসায়নিকও ব্যবহার করেন না। হঠাৎ 'অর্গানিক ফুড' কথাটা জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। কিছু ব্যবসায়ী ব্যাপারটাকে লুফে নিয়েছে। বাজারে মিলছে অর্গানিক সবজি, ফল। মওকা বুঝে দু পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। চাহিদা বাড়ছে ব্রাউন ব্রেডের। পাউরুটিকে লালচে রঙ করে ব্রাউন ব্রেড বলে চালিয়ে খদ্দেরের ঘাড় ভাঙার উদাহরণ চোখ খোলা রাখলেই টের পাওয়া যায়। বিজ্ঞানে অন্ধ বিশ্বাসও ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের মতো ক্ষতিকর। কারণ বিজ্ঞান এখন আর নিখাদ জ্ঞানচর্চা নয়। তা নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র। বৃহত্তর ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্থা। এ নিয়েও সচেতন হওয়ার সময় এসেছে।

আমাদের উদ্বেগ বাড়ছে আত্মহত্যা আর তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে খুন নিয়েও। সম্প্রতি টাইমস অভ ইন্ডিয়া পত্রিকায় সন্তোষ দেশাই আমেরিকায় বন্দুক-সংস্কৃতির বাড়াবাড়ি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। জানিয়েছেন, সে দেশে এখন ২৭ কোটি লোকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। মানে প্রতি ১০০ জনে ৮৮ জনের কাছে। ফি বছর ৩০ হাজার লোক প্রাণ হারায় বন্দুকের গুলিতে। আমেরিকার এই সমস্যা নিয়ে আমরা মাথা না ঘামাতেও পারি। কিন্তু অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের কথায় কথায় আত্মহত্যা আর খুন ক্রমশ জলভাত হয়ে উঠছে। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী প্রেমিকের সাহায্যে স্বামীকে, বাবা ছেলেকে– যে যাকে পারছে খুন করছে। রাজনৈতিক খুনোখুনির কথা তো বাদই দিলাম। এই দুই সমস্যা নিয়ে পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী বা রাজনীতিক কেউই রা কাড়ছেন না। আশ্চর্য!

আসি নিজেদের কথায়। কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে উৎস মানুষ পত্রিকাকে জন্ম দিয়েছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্ধুরা একে একে সরে গেলেও অপত্য স্নেহে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন পত্রিকাকে। হৃদ-সমস্যা ছিল। ১৭ নভেম্বর ২০০৮-এ হঠাৎ প্রয়াত হন। আমরা দু-চারজন টিম টিম করে জ্বলা পত্রিকার সঙ্গে লেপ্টে ছিলাম। সীমিত সামর্থ্য নিয়ে অশোকদার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ত্রৈমাসিক হলেও পত্রিকা প্রকাশ নিয়মিত হয়েছে। প্রকাশিত হচ্ছে বইও। এ বছরই বইমেলায় বেরোচ্ছে বন্যা নিয়ে বই। পত্রিকার অন্যতম সম্পদ ছিল 'আহরণ'। সমভাবনার অসাধারণ সব রত্নরাজি উদ্ধার করে ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়। এবার তারও সঙ্কলন প্রকাশিত হতে চলেছে। এসবের পাশাপাশি আমাদের বিশেষ উদ্‌যোগ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা। সেই ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয়েছে। অশোকদার প্রয়াণের দিনটিতে করা সম্ভব হয় না। তার আশপাশে একটা দিন বেছে নেওয়া হয়। এবারের অনুষ্ঠান ১৮ নভেম্বর। শনিবার। বক্তা বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়বস্তু জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান? কেন এমন বিষয় নির্বাচন তা নিয়েও দু কথা বলা দরকার। উৎস মানুষই একমাত্র পত্রিকা, যারা শুধু জ্যোতিষ-বিরোধী লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয় নি, প্রকাশ করেছে 'বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ' নামে একটি বই। যা বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে জ্যোতিষ-বিরোধী লড়াইয়ে মস্ত হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। পরে এই ধারায় সংযোজিত হয়েছে অমলেন্দুবাবুরই লেখা বই 'জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান'। এই পরম্পরাতেই বক্তৃতার বিষয় হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে জ্যোতিষকে। আপনারা সবাই আসুন। চেষ্টা করি সঙ্কট থেকে বেরনোর রাস্তা খোঁজার। দেখা হবে ১৮ নভেম্বর, বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের আলোচনাকক্ষে।

উমা

আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি

আশীষ লাহিড়ী

(২)

বিদ্যানিধির কাণ্ডজ্ঞান

যে অল্প বাঙালি সম্বন্ধে 'বহুশাস্ত্রজ্ঞ' (পলিম্যাথ) শব্দটা চোখ বুজে প্রয়োগ করা যায়, বাঁকুড়ার যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৮৫৯-১৯৫৬) তাঁদের অন্যতম। যোগেশচন্দ্র ছিলেন: একাধারে রসায়নবিদ, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ, বিজ্ঞানশিক্ষক, বাংলায় বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক-লেখক, পুরাতত্ত্ববিদ, প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস-লেখক এবং বাংলা ভাষার প্রথম বিজ্ঞানসম্মত অভিধান-প্রণেতা। খোদ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে ঋণী ছিলেন।

যোগেশচন্দ্রের '*আমাদের জ্যোতিষ ও আমাদের জ্যোতিষী* (*Our Astronomy and Our Astronomers*)' একটি অমূল্য গ্রন্থ। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য এই মানুষটিই আবার ইংরেজি না-জানা চিরাচরিত জ্যোতিষিক আকাশ-পর্যবেক্ষণে অভ্যস্ত ওড়িশার চন্দ্রশেখর সামন্তর গণনা দেখে মুগ্ধ হন এবং সংস্কৃত ভাষায়, কিন্তু ওড়িয়া লিপিতে লেখা চন্দ্রশেখর সামন্তর *সিদ্ধান্তদর্পণ* (১৮৬৯) দেবনাগরী লিপিতে ছাপার ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই নয়, 'এ মডার্ন টাইকো' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠান 'নেচার' পত্রিকায়। সেখানে তিনি চন্দ্রশেখর সামন্তকে নিখুঁত পর্যবেক্ষণের জন্য প্রসিদ্ধ ডেনিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১)-র সঙ্গে তুলনা করেন, এমনকি ব্রাহের তুলনায় উন্নত বলে মত প্রকাশ করেন। ভারতীয়দের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এটি একটি মূল্যবান সংযোজন বলে গণ্য। সঙ্গত কারণেই ওড়িশার পণ্ডিতসমাজের দেওয়া 'বিদ্যানিধি' উপাধিটি তাঁর নামের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে।

বহুশাস্ত্রজ্ঞতার, বিশেষ করে বিজ্ঞান জানার, শাস্তি দিতে আমরা অবশ্য কসুর করিনি। মানুষটিকে আমরা কার্যত ভুলে মেরে দিয়েছি।

কিন্তু প্রশ্ন: বিদ্যেবোঝাই এই বিদ্যানিধি মশাইয়ের কি কাণ্ডজ্ঞান ছিল? উত্তরটা হ্যাঁ এবং না। নইলে খেয়েদেয়ে কাজ নেই, কটকের র‍্যাভন্‌শ কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার (সময় বিশেষে রসায়নেরও) এই সম্মানিত অধ্যাপক গাঁয়ের সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে অতি সহজে বসানো ও চালানো যায় এমন একটি নলকূপের নকশা করবেন কেন? স্বয়ং রাজশেখর বসু সেটি দেখে উৎসাহিত হয়ে পেটেন্ট নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। নলকূপটি তৈরি করে বাজারে ছাড়ারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, সেটি

নবম অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মারক বক্তৃতা

বিষয়: জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান

বক্তা: অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম সেমিনার হল

১৮ নভেম্বর ২০১৭, শনিবার, বিকেল ৫-৩০

এত বেশি শস্তা আর আজকালকার ভাষায় 'ইউজার-ফ্রেন্ডলি' যে, প্রস্তুতকারক কোম্পানির পক্ষে সেটি বেচে যথোচিত লাভ করা দুঃসাধ্য। অতএব সেটি আর তৈরি করাই হল না! অর্থাৎ যোগেশচন্দ্রের কাণ্ডজ্ঞান ছিল; কিন্তু এত বেশি ছিল না যাতে এই বৈশ্য দুনিয়ার হালচাল তিনি বিশেষ আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। কাহিনীটি একটু 'বাখানিয়া' বলি।

একসময়কার প্রসিদ্ধ রস-পত্রিকা 'যষ্টিমধু'র সম্পাদক কুমারেশ ঘোষদের ওরিয়েন্টাল মেশিনারি সাপ্লাইং এজেন্সি নামে এঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতির এক পারিবারিক ব্যবসা ছিল। রাজশেখর বসুর সঙ্গে তাঁর এই নলকূপ তৈরির ব্যাপারে বিস্তারিত কথাবার্তা হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে কুমারেশ ঘোষ রাজশেখর বসুকে বলেন, 'যোগেশচন্দ্রের ডিজাইন-করা ওই পাম্পটি দিয়ে শুধু যে খুব সহজে জল তোলা যায় তাই নয়, সেটি খুব সহজে তৈরি করাও যায়। আর যে শহরে একবার এই পাম্প চালু হবে, সে শহরে কোনও লোক আর কিনবে না। দরকার মতো বানিয়ে নেবে।... কাজেই কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির পক্ষে এ জিনিস বানানো লাভের হবে না।... তাছাড়া এ জিনিস অনেক না করলে পোষাবেও না। কম দামে বেশি ছাড়তে হবে বাজারে। বিজ্ঞাপন দিতে হবে, সেলস্‌ম্যান রাখতে হবে, দরকার হলে গ্রামে গ্রামে কুয়োয় এই পাম্প কাজ করে দেখাতে হবে...তবে সত্যিই জিনিসটা ভালো। কোনো গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এ পাম্প চালু করলে ভালো হয়।' অর্থাৎ নলকূপটি এত বেশি জন-উপযোগী যে বাজারি অর্থব্যবস্থায় সেটি মোটেই লাভজনক নয়! বেঙ্গল কেমিক্যাল পরিচালনার সূত্রে এর অর্থনীতিটা রাজশেখর বসু সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। খানিকটা অসহায়ভাবেই বলেছিলেন তিনি: 'গভর্ণমেণ্ট এ ব্যাপারটা নিজের হাতে নিলেই সবচেয়ে সুবিধে হয়। আর যোগেশবাবুও বাঁকুড়ায় একটা পাম্প বসিয়ে লোককে এর কাজ দেখাতে পারেন। তবে তাঁর বয়স এখন ছিয়ানব্বই।' কুমারেশ ঘোষ বলেন, যোগেশবাবুর ছেলেরা তো এ বিষয়ে চেষ্টা করতে পারেন। রাজশেখর বসুর মন্তব্য: 'করলে তো ভালোই হতো।' কুমারেশবাবু এমনকি এমন প্রস্তাবও দেন যে, 'যদি যোগেশবাবু চান, তবে আমাদের কারখানায় একটা পাম্প তৈরি করে তাঁকে দিতে পারি।' (কুমারেশ ঘোষ, 'শ্রদ্ধেয় শ্রীরাজশেখর বসুর সঙ্গে কিছুক্ষণ', 'যষ্টিমধু' থেকে পুনর্মুদ্রিত, বৈশাখ - ১৩৬৭। ইং - এপ্রিল ১৯৬০। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ক্ষুদিরাম বসু সেন্ট্রাল কলেজ, কলকাতা ২০০৮)। এটা স্বাধীনতার পরের কথা। এ বিষয়ে আর কিছু জানা যায় না। ১৯৫৬ সালে, সাতানব্বই বছর বয়সে যোগেশচন্দ্রর মৃত্যু হয়।

তবে তাঁর জোরালো কাণ্ডজ্ঞানের আর একটা নমুনা দিই। ১৮৮৩ সালে এম এ পাস করে যোগেশচন্দ্র সরকারি কলেজে পড়ানোর চাকরি পান। অর্থাৎ তাঁর ছিল বদলির চাকরি। ১৮৮৮ সালে তাঁকে কয়েক মাসের জন্য চট্টগ্রামে বদলি করা হয়। তখন তিনি কলকাতা মাদ্রাসা কলেজে পড়াতেন। ক্রমে চট্টগ্রামে তিনি বেশ সুন্দরভাবে থিতু হলেন। বিজ্ঞানশিক্ষক হিসেবে তিনি অসম্ভব জনপ্রিয় হন। এতই জনপ্রিয় যে, পরে যখন আবার কলকাতা ফেরত আসেন, তখন স্থানীয় লোকজন আর ছাত্ররা তাঁকে ছাড়তে চায়নি।

চট্টগ্রাম থাকাকালীন, তিনি ঠিক করেন, সীতাকুণ্ড দেখতে যাবেন, সেখানে নাকি 'জলের উপরে আগুন জ্বলছে। ...চাটিগাঁ হতে সীতাকুণ্ড ২৪ মাইল উত্তরে। যেতে আসতে তিন দিন লাগবে। ...রাত্রে রওয়ানা হয়ে পরদিন বেলা ৭টার সময় এক স্থানে এলাম। নাম ভুলে গেছি। সেখানে পথের ডানদিকে একটু দূরে দুই কুণ্ড ছিল, দিবারাত্র আগুন জ্বলছে। লোকে বলে সে আগুন নিবে না। বোধ হয়, একটার নাম লবণাক্ষ অর্থাৎ লবণকুণ্ড। দেখলাম একটা নীচু পাথরের পাহাড়ে দুই নীচু মন্দির, ভিতরে জলের চৌকা। এইটি কুণ্ড, পাথর সাজিয়ে করা হয়েছে, জলের উপরে অগ্নিশিখা। কুণ্ড দুটি নীচে, দূরের পাহাড়ের জল এসে ভর্তি হচ্ছে, অতিরিক্ত জল গায়ের নানাদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেখানে পাণ্ডা ও যাত্রী ছিল। অগ্নিশিখা নিবে যায় কিনা, সে পরীক্ষা করতে পারা গেল না।'

অর্থাৎ তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল, সত্যিসত্যিই জলের মধ্যে আগুন জ্বলে কিনা তা পরখ করা। কিন্তু তীর্থযাত্রী আর পাণ্ডারা হাজির থাকায় তাঁর সে-ইচ্ছা পূর্ণ হল না।

কিন্তু তিনি হাল ছাড়লেন না। 'দু'ক্রোশ আগিয়ে আর এক কুণ্ড, বড়বা কুণ্ড, পথ হতে ডানদিকে দূরে বনের মধ্যে। আরও দূরে আরও বনে সূর্যকুণ্ড, আর সহস্রধারা।' জানা গেল, 'পাণ্ডা আগে গেছে, যেতে, যেতে পথে দেখা হবে। ...আবার চলি, দূর হ'তে মন্দিরের মতন দেখতে পেলাম, সেইদিকে চ'ললাম। আধ মাইল এসে মন্দির পেলাম। পাহাড়টা সমতল, সেখানে মন্দির। চারিদিকে ইটের পাঁচীড়, দরজায় তালা। সব বৃথা হ'ল।'

সব বৃথা হল কেন? মানে এখানেও জলে আগুন জ্বলার সত্যাসত্য পরখ করা হল না। একটু হতাশ হয়ে যোগেশচন্দ্র তালাটা ধরে এক টান মারলেন। '...দেখি, চাবি দেওয়া নেই, খুলে গেল। ভিতরে উঠান, উঠনে ঘাস, একপাশে মন্দির। কপাট ছিল না, দশ পনেরো ধাপ নীচে কুণ্ড, অন্ধকারে অগ্নিশিখা লকলক করছে। আমি নেমে যেয়ে জল ছিটিয়ে, ছিটিয়ে নিবিয়ে দিলাম। আগুন নিবে না বলছিল, মিথ্যা কথা। জলের ভিতর হতে দাহ্য গ্যাস উঠছে, সে গ্যাস জ্বেলে রাখা হয়েছে। জল কেনই বা গরম হ'বে। 'জলের উপরে আগুন জ্ব'লছে' কথাটা শু'নলে মনে হয় বুঝি কাঠ বা কয়লা আছে।' কারসাজিটা ধরে ফেলে তাঁর কৌতূহল নিবৃত্ত হল। তিনি চাইলেন আগুনটা আবার জ্বেলে দিয়ে আসতে। কিন্তু 'সঙ্গে দিয়াশালাই ছিল না, জ্বেলে দিয়ে আ'স্তে পারা গেল না। আমরা বাইরের কপাট ও তালা লাগিয়ে ফিরে আসছি, পাণ্ডার সঙ্গে দেখা হ'ল, সঙ্গে তিন যাত্রী।'

এইবার জমল নাটক। যোগশচন্দ্র বললেন, 'আমরা তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, মোহন্ত বলেছিলেন, পথে দেখা হ'বে।' পাণ্ডার উত্তর: 'এই যাত্রীদের জন্য একটু দেরি হয়ে গেল। আসুন'। যোগেশচন্দ্র লিখছেন, 'ঢুকলেই ধরা পড়ে যাব, এখনই পলায়ন কর্তব্য।' কিন্তু তখন আর কী করা! 'মন্দিরের দ্বারে এসে পাণ্ডা থমকে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখ ম্লান হয়ে গেল। আমার পায়ের দিকে চেয়ে দেখলেন, পা ভিজা।' পাণ্ডা বুঝল, তার কারসাজি ধরা পড়ে গেছে। কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'বাবু আপনারা যাত্রী (অর্থাৎ তীর্থযাত্রী) নন, তা' বুঝেছি। আপনাদের সঙ্গে প্রতারণা ক'রতাম না। কেন এমন করলেন?' আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, পাণ্ডার জোচ্চুরি এইভাবে ধরা পড়ে যাওয়ায় যোগেশচন্দ্রের মনে 'শেল' বিঁধল। আহা, বেচারির রুজিরোজগারে হাত পড়ল। শাস্তি দেওয়া দূরের কথা, তিনি 'কিছু পয়সা দিয়ে শান্ত' করলেন পাণ্ডাটিকে। কারণ, তার আর 'সেদিন যাত্রীদিকে ব্রহ্মাগ্নি দেখানো হ'ল না।'

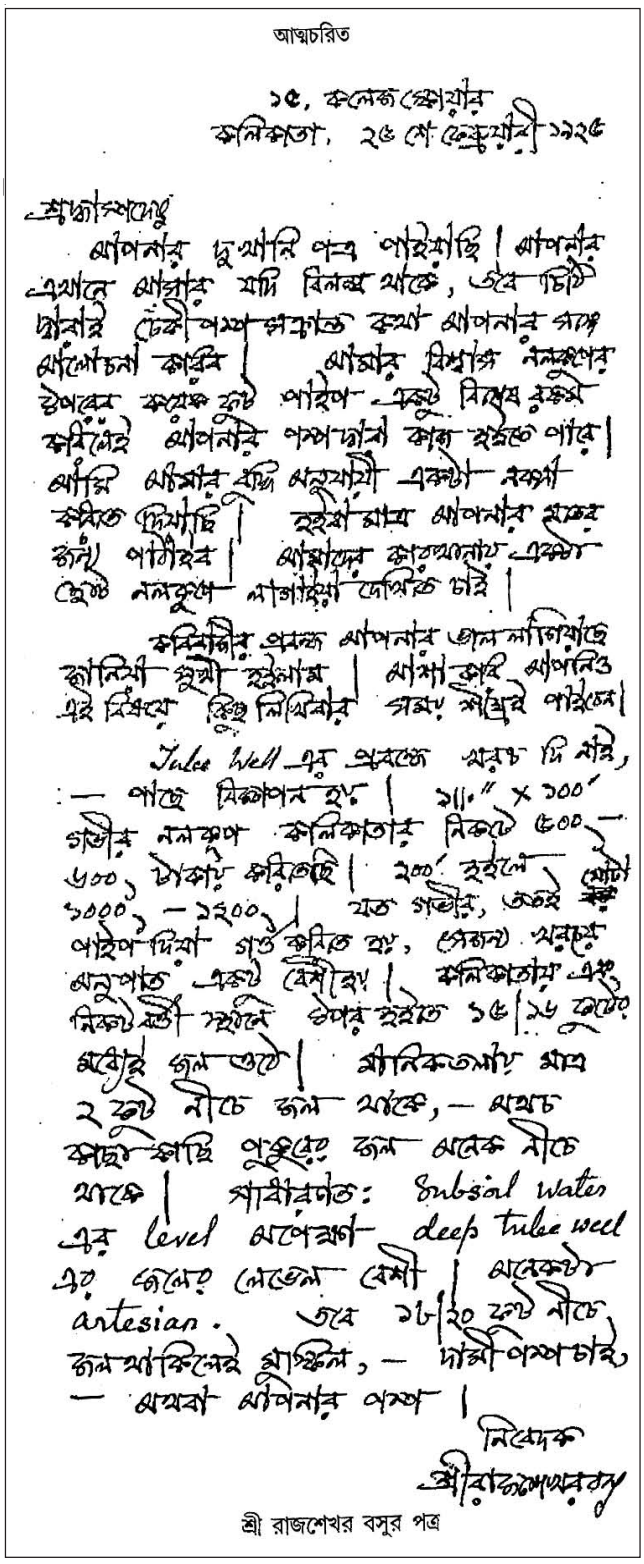

আত্মচরিত

১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার দুখানি পত্র পাইয়াছি। আপনার এখানে আসার যদি বিলম্ব থাকে, তবে চিঠি দ্বারাই ঢেঁকী পাম্প সংক্রান্ত কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করিব। আমার বিশ্বাস নলকূপের উপরের কয়েক ফুট পাইপ একটু বিশেষ রকম করিলেই আপনার পাম্প দ্বারা কাজ হইতে পারে। আমি আমার বুদ্ধি অনুযায়ী একটা নকশা করিতে দিয়াছি। হইয়া মাত্র আপনার মতের জন্য পাঠাইব। আমাদের কারখানায় একটা ছোট নলকূপে লাগাইয়া দেখিতে চাই।

কবিরাজীর প্রবন্ধ আপনার ভাল লাগিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আশা করি আপনিও এই বিষয়ে কিছু লিখিবার সময় শীঘ্রই পাইবেন।

Tube Well এর প্রবন্ধে খরচ দি নাই, — পাছে বিজ্ঞাপন হয়। ১॥০" × ১০০' গভীর নলকূপ কলিকাতার নিকটে ৫০০ — ৬০০ টাকায় করিতেছি। ২০০' হইলে মোটা ১০০০ — ১২০০। যত গভীর, ততই বড় পাইপ দিয়া গর্ত করিতে হয়, সেজন্য খরচের অনুপাত একটু বেশী হয়। কলিকাতায় এবং নিকটবর্তী স্থানে উপর হইতে ১৫/১৬ ফুটের মধ্যেই জল ওঠে। মানিকতলায় মাত্র ২ ফুট নীচে জল থাকে, — অথচ কাছাকাছি পুকুরের জল অনেক নীচে থাকে। সাধারণত: Subsoil water এর level অপেক্ষা deep tube well এর জলের লেভেল বেশী। অনেকটা artesian. তবে ১৮/২০ ফুট নীচে জল থাকিলেই মুস্কিল, — দামী পাম্প চাই, — অথবা আপনার পাম্প।

নিবেদক
শ্রীরাজশেখর বসু

শ্রী রাজশেখর বসুর পত্র

এখানেই শেষ নয়। আরো খানিকটা দুর্গম পাহাড়ি পথ পেরিয়ে যোগেশচন্দ্র গিয়ে পৌঁছলেন সীতাকুণ্ডে। কী দেখলেন? ‘নামটি মিথ্যা। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের জল গরম, এখানে ঠাণ্ডা।... শম্ভুনাথের পরে একটা ঘন-বোনা বাঁশের পাঁচীর ঘেরা চৌচালা। খড়ের ছাঅনি। ঘরখানি পথ রোধ করে আছে। বাঁদিকে একটা কুঠরী। ডান-দিকের ঘর দিয়ে পথ। কিন্তু প্রবেশদ্বার ও নির্গম দ্বার ঋজু নয়, তির্যক। ...শিবরাত্রির দিন পঞ্চাশ হাজার যাত্রী আসে, সে পথে এক পয়সা না দু পয়সা আদায় করা হয়। সেই ছলে স্ত্রীলোকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। ...চাটিগাঁ ও পূর্ব বঙ্গ হ’তে যাত্রী আসে, বারো আনা স্ত্রীলোক, চার আনা পুরুষ। ...পয়সা আদায় করতে হ’লে নীচে সমতলে পাঁচ-সাতটা দ্বার করলে চ’লত। এখানে সরুপথে ইঁদুর ধরা কল করতে হ’ত না। তখন ব্যাপারটা আমার হৃদয়ঙ্গম হ’ল। হায় আমার দেশ।’ (উদ্ধৃতিগুলি যোগেশচন্দ্রের ‘আত্মজীবনী’ থেকে নেওয়া। বানান অপরির্তিত)

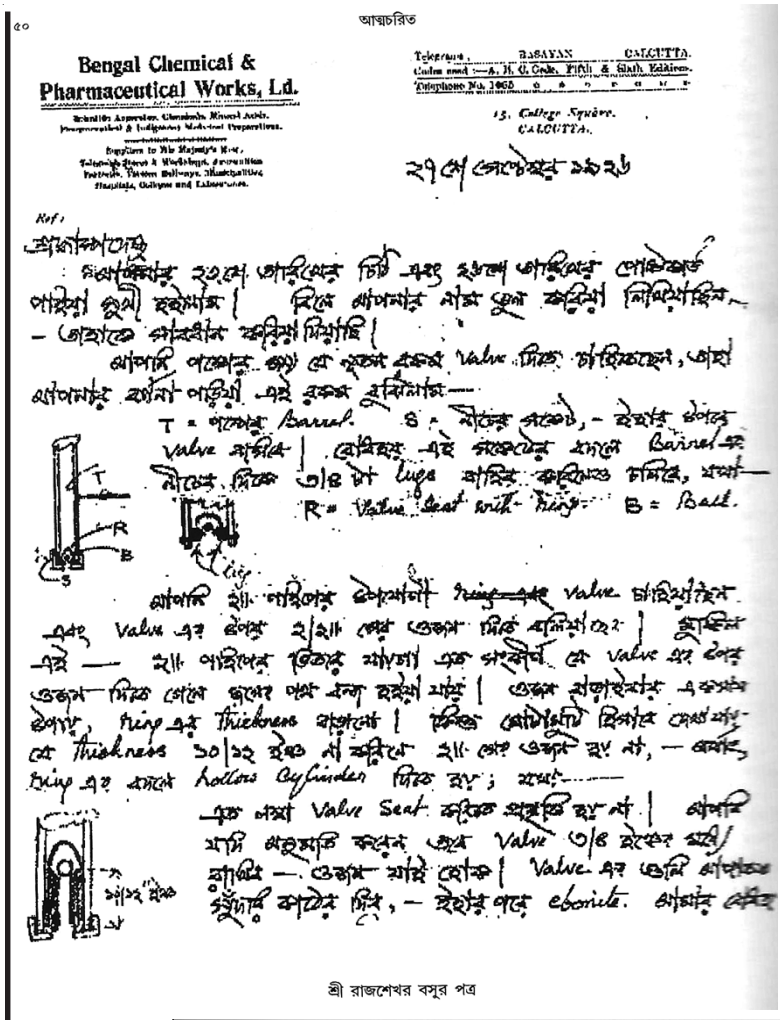

বলা দরকার, যোগেশচন্দ্র কিন্তু আমাদের মতো পাষণ্ড নাস্তিক ছিলেন না; ছিলেন দস্তুরমতো শাক্ত। পুরাতত্ত্বে পণ্ডিত মানুষটি শাক্তধর্ম নিয়ে বিস্তর পড়াশোনাও করেছিলেন। কিন্তু জাতের নামে বজ্জাতির মতো ধর্মের নামে অধর্ম দেখলে তাঁর বিজ্ঞানী-বিবেক শিহরিত হত।

এইবার পাঠকরা বলুন, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির কাণ্ডজ্ঞান ছিল, কি ছিল না?

উমা

শ্রী রাজশেখর বসুর পত্র

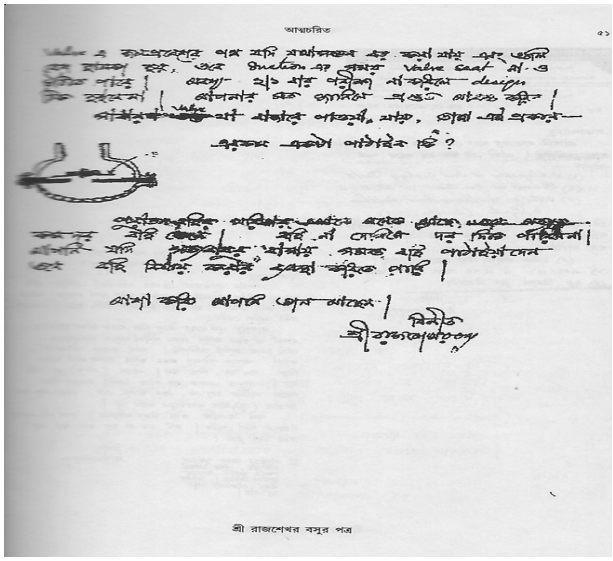

শ্রী রাজশেখর বসুর পত্র

প্রসঙ্গ: এ-বছরে দক্ষিণবঙ্গের বন্যা

তপোব্রত সান্যাল

পশ্চিমবঙ্গে বন্যা পর্যায়ক্রমিক ঘটনার মতো। প্রতি বছর কোথাও-না-কোথাও ঘুরে ঘুরে আসে। এ বছরের (২০১৭) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিমের জেলাগুলি। ঠিকভাবে বললে ভাগীরথী-হুগলি নদীর পশ্চিমের জেলাগুলি। উত্তরবঙ্গের বন্যা হয়েছে এই লেখা শেষ করার সময়। এবারে জুলাই মাসে ঐ জেলাগুলিতে বৃষ্টি হয়েছে আগে যা মনে করা হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঁধগুলি (ড্যাম) থেকে ছাড়া বিপুল পরিমাণ জল। প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও ঝাড়খণ্ডতেও এবার বৃষ্টি হয়েছে অতিরিক্ত। অনেকে বলেছেন, বৃষ্টিপাতের চেয়ে বাঁধ-থেকে-ছাড়া অতিরিক্ত জলই এবারের বন্যার মূল কারণ। এই কারণে এবারের বন্যা নাকি মনুষ্যকৃত। অর্থাৎ বাঁধ থেকে জল ছাড়ায় নিয়ন্ত্রণ থাকলে এবারের বন্যার তীব্রতা হয়ত এড়ানো যেত। এই ধারণার সারবত্তা বিচার করতে হলে বিষয়টি আনুপূর্বিক খতিয়ে দেখা দরকার, যদিও এই নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে সব কথা বিশদভাবে বলা যাবে না।

বন্যার মূল উৎস হল অতিরিক্ত বৃষ্টি। কিন্তু শুধু অতিরিক্ত বৃষ্টিই বন্যার একমাত্র কারণ নয়। বৃষ্টির তীব্রতা (ইন্টেন্সিটি) বন্যার মূল কারণ। অল্প সময়ে তুমুল বৃষ্টি হলে বৃষ্টির দরুন তৈরি জলধারা (সারফেস রান-অফ) সহজে বের হতে পারে না। এই জলধারা গিয়ে পড়ে কাছাকাছি খালে ও নদীতে। এছাড়া, অববাহিকার নিচু জমি ও জলাশয়গুলিতে জমা হয় ওই জল। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি নদীর নির্দিষ্ট জলধারণ ক্ষমতা থাকে। তার বেশি জল নদীতে গিয়ে পড়লে তা দু কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নদীর জলতল যখন তার সর্বোচ্চ প্লাবন-সীমা (হাইয়েস্ট ফ্লাড লেভেল- এইচ এফ এল) ছড়িয়ে যায়, তখনই বন্যা পরিস্থিতির সূচনা হয়। নদী সংলগ্ন পরিবাহ ক্ষেত্রে যখন জল-মজ্জন বেশ কিছুদিন স্থায়ী হয়, তখন তাকে বন্যা বলা হয়। বৃষ্টির তীব্রতা এবং নদীর জলধারণ ক্ষমতা ও জল নিকাশের সামর্থ্য (ড্রেনেজ এফিসিয়েন্সি) বন্যার প্রধান নিয়ামক।

বন্যা নিয়ন্ত্রক অনেক বাঁধ এবারের বন্যাগ্রস্ত অঞ্চলে অনেক আগেই নির্মিত হয়েছে। বাঁধ-সংলগ্ন জলাধারগুলিরও জলধারণ ক্ষমতা নির্দিষ্ট করা আছে। জলাধারের জলধারণ ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে গেলে অতিরিক্ত জল না ছেড়ে উপায় থাকে না। বৃষ্টিতে মাটির ওপর দিয়ে বয়ে চলা জলধারা খাল ও নদী ছাড়াও নিচু জমি ও জলাশয়গুলিতে সঞ্চিত হয়। যেভাবে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, যেভাবে বাড়ছে নিচু জমি ভরাট করে বসতি স্থাপনের প্রবণতা, তাতে নিচু জমি ও জলাশয় বলতে তেমন আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই বাড়ছে।

মনে রাখতে হবে, সব নদীই আসলে জল নির্গম প্রণালী ছাড়া কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতম জলনির্গম প্রণালী হল ভাগীরথী-হুগলি নদী। দক্ষিণ-পশ্চিমের সহায়ক অন্য জল নিঃসারক নদীগুলি হল--- অজয়, রূপনারায়ণ, কংসাবতী, হলদি ও দামোদর। সব নদীই সঙ্গত হচ্ছে ভাগীরথী-হুগলিতে সরাসরি অথবা নানা পথ ঘুরে অন্য সব ছোট ছোট নদীর ধারায় পুষ্ট হয়ে। ভাগীরথী-হুগলির পশ্চিমবর্তী প্রায় সব নদীই অনিয়ত-প্রবাহী— বর্ষায় পূর্ণ, বৃষ্টিহীন মাসগুলিতে ক্ষীণতোয়া। এক এক নদীর এক এক রকম জলধারণ সামর্থ্য, ঔদক বৈশিষ্ট্য, (Hydraulic characteristic) আচরণ। তাই সব নদীর আচরণ ও জলবহন সামর্থ্যকে একই ধাঁচে ফেলা যায় না। এছাড়া মানুষের নির্বোধ খবরদারিতে নদীর স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়ে চলেছে; ফলে তাদের আচরণেও ঘটছে বদল। নদীকে নির্জীব ভাবলে ভুল হবে। বাধা পেলে সে প্রতিবাদ করবেই!

এবারে এ বছরের বন্যার প্রসঙ্গে আসি। বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় পরিমাণ বিচার করে এ বছরের বন্যাগ্রস্ত জেলাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে আছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম জেলা। যেখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টির পরিমাণ ১১২৫ মিমি থেকে ১৪০০ মিমি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ছে নদীয়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর ও উত্তর ২৪ পরগনা। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত এই জেলাগুলিতে ১৪০০ মিমি থেকে ১৬০০ মিমি। তৃতীয় শ্রেণীতে আছে হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর, সেখানে বার্ষিক গড় ধারাপাত ১৬০০ মিমি থেকে ১৯০০ মিমি-র মধ্যে। এ বছর জুলাই

মাসে খুব বেশি বৃষ্টি হয়েছে এই অঞ্চলে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণের নিচের নমুনা থেকে গত জুলাই মাসে ধারাবর্ষণের তীব্রতা অনুমান করা যাবে।

বৃষ্টির কাল-ব্যাপ্তি— ২০ থেকে ২৬ জুলাই

জেলা	
পুরুলিয়া	স্বাভাবিকের চেয়ে ৬৮১% বেশি বৃষ্টি
বাঁকুড়া	স্বাভাবিকের চেয়ে ৫৫৭% বেশি বৃষ্টি
পূর্ব মেদিনীপুর	স্বাভাবিকের চেয়ে ৩৩৩% বেশি বৃষ্টি
পশ্চিম মেদিনীপুর	স্বাভাবিকের চেয়ে ২৬৪% বেশি বৃষ্টি
হাওড়া	স্বাভাবিকের চেয়ে ৩২৩% বেশি বৃষ্টি

শুধু পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ও পশ্চিমে নয়, প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড ও বিহারেও এবার প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে এ রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে।

এ রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত সব নদীর উৎপত্তি স্থল কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নয়। দামোদর নদের উৎস ঝাড়খণ্ডের পালামৌ জেলার খামারখাত পাহাড়। প্রথমে ঝাড়খণ্ড, পরে পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত ঐ নদী শেষে ফলতার কাছে হুগলি নদীতে মিশেছে। দামোদরের প্রবাহ পথ অতীতে বার বার বদলেছে। অতীতে সপ্তদশ শতকে ৫৪১ কিমি দীর্ঘ এই নদ গাঙ্গুর ও বেহুলা নদীর খাত ধরে কালনার কাছে মিশত। ১৬৬০ সালের বন্যার পর দামোদর আমতার খাত দিয়ে বইতে শুরু করে। তখন এই খাতটিকে বলা হত মণ্ডলঘাট নদী। পরে বেগুয়া খাল (অন্য নাম কাকি নদী) মারফত দামোদরের অতিরিক্ত জল মুণ্ডেশ্বরী নদী হয়ে রূপনারায়ণ নদে পড়ত। দামোদর উপত্যকায় যে বহুমুখী (মাল্টিপারপাস) পরিকল্পনা স্বাধীনতার পর নেওয়া হয়, তাতে এ পর্যন্ত চারটি বাঁধ ও একটি সরন্ধ্র বাঁধ (ব্যারেজ) নির্মিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

রূপনারায়ণের উৎসও ঝাড়খণ্ডে তিলারি পাহাড়ে। ২৫৪ কিমি দীর্ঘ এই নদ ঋদ্ধ হয়েছে মুণ্ডেশ্বরী, শিলাবী ও দ্বারকেশ্বরের জলে। নুরপুরের কাছে অবসিত হয়েছে এর প্রবাহ পথ। রূপনারায়ণ হুগলি নদীতে মেশার পর হুগলি নদী প্রায় সমকোণে বাঁক নিয়েছে যেটা আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা অস্বাভাবিক ও অতীতে নদী দুটির গতি পথ বদলের ইঙ্গিতবাহী।

ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনার মালভূমিতে উৎসারিত হয়েছে ময়ূরাক্ষী। ২৪১ কিমি দীর্ঘ এই নদী দত্তবাটির কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে। ময়ূরাক্ষীর উল্লেখযোগ্য উপনদী হল ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর ও কোপাই।

অজয় নদের উৎস ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনায়। ২৭৬ কিমি দীর্ঘ এই নদ কাটোয়ার কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে।

কংসাবতী ও হলদি একই নদী। কংসাবতী (লোকনাম 'কাঁসাই') উৎসারিত হয়েছে ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে। মেদিনীপুরের কেশপুরে এসে কংসাবতী দু ভাগে ভাগ হয়েছে। একটি শাখা মিশেছে রূপনারায়ণে, অন্যটি কেলেঘাই নদীতে। কেলেঘাই ও কাঁসাইয়ের মিলিত প্রবাহই হল হলদি নদী, যা হলদিয়ার পাশ দিয়ে হুগলি নদীর হলদিয়া চ্যানেলে মিশেছে। কংসাবতীর ওপর নির্মিত হয়েছে দুটি বাঁধ, কাটা হয়েছে বেশ কয়েকটি খালও।

দেখা যাচ্ছে, এ রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত সব প্রধান নদীর উৎস হল ঝাড়খণ্ড। ঝাড়খণ্ডে এবার স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি বৃষ্টি হয়েছে। ফলে, বাঁধের জলাধারগুলিতে জল সঞ্চয়ও হয়েছে বেশি। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, বেশি বৃষ্টি হলেই যদি বাঁধের জলাধারগুলি থেকে জলছাড়া অনিবার্য হয়ে ওঠে, তবে বন্যা নিয়ন্ত্রক প্রকল্পগুলির পরিকল্পনায় গোড়াতেই ত্রুটি ছিল কিনা! দামোদর নদের উপত্যকায় বহুমুখী (মাল্টিপারপাস) সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রক পরিকল্পনার কথা প্রথম মাথায় আসে বিজ্ঞানাচার্য মেঘনাদ সাহার। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি ভ্যালি কর্পোরেশনের আদলে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠনের পরামর্শ দেন তিনি। 'প্ল্যানিং ফর দামোদর ভ্যালি' (১৯৪৪-এ তাঁর ছাত্র কমলেশ রায়ের সঙ্গে যৌথভাবে লেখা) ও 'দ্য দামোদর ভ্যালি রিক্লেমেশন স্কিম' (১৯৪৬) এই দুটি নিবন্ধে তিনি বন্যাপ্রবণ দামোদর উপত্যকায় বাঁধ নির্মাণ করে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এই দুটি নিবন্ধে অধ্যাপক সাহা দামোদরের ওপর বাঁধ নির্মাণের সম্ভাব্য স্থানগুলির তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন, বলেছেন ভূমিক্ষয় রোধে বন সৃজনের কথা, আলোচনা করেছেন বাঁধের জলাধারগুলিতে পলি সঞ্চয়ের সম্ভাব্যতার বিষয়টি এবং সেই সঙ্গে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রসঙ্গও। অধ্যাপক সাহা গাঙ্গেয় বঙ্গের বন্যা সংক্রান্ত বিষয়ে মোট ১১টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার প্রত্যেকটিতে তাঁর অনুসন্ধানী দূরদৃষ্টি প্রতিভাসিত হয়েছে।

ডি ভি সি-র প্রথম প্রকল্প প্রতিবেদনের রচয়িতা ছিলেন ডব্লু এল ভুরডুইন (W L Voorduin)। প্রতিবেদনের শিরোনাম

ছিল— 'The Unified Development of Damodar River'। ভুরডুইনের প্রতিবেদনে ৭টি বাঁধ নির্মাণের কথা ছিল। প্রথম পর্যায়ে ৪টি বাঁধ মাইথন, পাঞ্চেত, কোনার ও তিলাইয়াতে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত হবে বাকি তিনটি। ৭টি বাঁধের জলধারণ ক্ষমতা নির্ধারিত হয়েছিল ২৯.৯১ লক্ষ একর ফুট। যে চারটি বাঁধ এ পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে সেগুলির জলধারণ ক্ষমতা কিন্তু ১৫.১ লক্ষ একর ফুট। পাঞ্চেত ও মাইথনে নির্ধারিত পরিমাণ জলধারণের জন্য আরও জমি দরকার ছিল যা না পাওয়া যাওয়াতে ঐ চারটি বাঁধের সর্বোচ্চ জলসঞ্চয় সামর্থ্য ১০.৪১ লক্ষ একর ফুট। এখন সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ৬.৬ লক্ষ একর ফুটে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও চারটি বাঁধ নির্মাণ করলে সমস্যার সমাধান হবে কিনা তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কারণ নদীর আচরণ ও ভূমিরূপ অনেক বদলেছে, বদলেছে পরিবাহ অববাহিকার চরিত্রও। দামোদরের ওপর তেনুঘাটে একটি বাঁধ আছে; কিন্তু তাতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো সংস্থান নেই। দামোদর প্রকল্পের আওতায় দুর্গাপুরে একটি সরন্ধ্র বাঁধ (ব্যারেজ) তৈরি হয়েছে। দুর্গাপুরের জলাধার থেকে কলকাতার ৫৫ কিমি উজানে হুগলি পর্যন্ত একটি খাল কাটা হয়েছিল নৌ-পরিবহনের উদ্দেশে, যা অজ্ঞাত কারণে আজও অব্যবহৃত।

ময়ূরাক্ষী প্রকল্পে নির্মিত হয়েছে ম্যাসাঞ্জোরে ৬৪০ মি দীর্ঘ ও ৪৭.২৪ মি উঁচু কানাডা বাঁধ। বাঁধের জলে ২.৫১ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া হচ্ছে। ৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎও এখান থেকে উৎপন্ন হয়।

কংসাবতী প্রকল্পে দুটি বাঁধ নির্মাণের কথা। একটি মুকুটমণিপুরে, অন্যটি অম্বিকানগরে কুমারী ও কংসাবতীর সংযোগস্থলে। এছাড়া তিনটি সরন্ধ্র বাঁধ ও কয়েকটি খাল খনন করার কথাও এই প্রকল্পে। এই প্রকল্প থেকে ৪.০২ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ফরাক্কায় যে ব্যারেজ আছে, তার মূল উদ্দেশ্য ভাগীরথীকে পুষ্ট করা। সর্বোচ্চ ৪০,০০০ কিউসেক জল একটি সংযোগকারী খালের (ফিডার ক্যানেল) মাধ্যমে ফরাক্কার জলাধার থেকে ভাগীরথীতে পাঠানো যায়। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে জলবন্টন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তাতে ৪০,০০০ কিউসেক জল ভাগীরথীতে পাঠানো দূর পরাহত; কারণ ফরাক্কা জলাধারে অনুমিত জলের পরিমাণই থাকছে না। সুযোগ হলে এ বিষয়ে কিছু বলা যাবে।

বাঁধের জলাধারগুলির মূল সমস্যা হল জলধারণের ক্ষমতা ক্রমশ কমতে থাকা। বহু বছর ধরে পলি সঞ্চিত হতে হতে জলাধারগুলি জলধারণের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলছে। শুধু জল-অপসারক নদীগুলিই নয়, জলাধারগুলির জলধারণ সামর্থ্য হ্রাস পাওয়ার ফলে বন্যার আশঙ্কা এইসব অঞ্চলে বেড়ে গিয়েছে। শুধু এ রাজ্যে নয়, বিশ্বের সর্বত্র বাঁধের জলাধারগুলির একই সমস্যা। নদীতে পলি নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা না থাকাতে এই সমস্যার উদ্ভব। অবশ্য যত সহজে পলি নিয়ন্ত্রণের কথা বলা গেল, সমস্যাটা তার চেয়ে অনেক বেশি দুরূহ।

এ বিষয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গবেষক-প্রযুক্তিবিদ জি এল মরিস বলেছেন যে, ২০২০ সাল নাগাদ পলি সঞ্চয়ের ফলে ভারতের এক-পঞ্চমাংশ জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা অর্ধেক হ্রাস পাবে। এ সমস্যা নিরসনের উপায় হল (১) পলির উৎসকে নিয়ন্ত্রণ করে নদীর পলিভার কমানো, (২) পলিকে অন্যত্র চালিত করা (Sediment routing) এবং (৩) নিয়মিত পলি উত্তোলন। অন্য একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ১৯৫৬ সালে নির্মিত পাঞ্চেত জলাধার তার ধারণক্ষমতার অর্ধেক হারাবে ২০২১ সাল নাগাদ, ১৯৬৫-তে নির্মিত মাইথন জলাধারের ধারণক্ষমতা অর্ধেক হ্রাস পাবে ২০৫৪ সাল নাগাদ। (তথ্যসূত্র: সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইরিগেশন অ্যান্ড পাওয়ার-এর প্রতিবেদন ১৯৮১)। জলাধারে পলি নিয়ন্ত্রণের চতুর্থ পন্থা হিসেবে 'পলি আটকানোর ফাঁদ' তৈরি করার কথা ভাবা যায়। জলাধারের গর্ভতলের ঢাল যেন ঐ 'ফাঁদের' দিকে থাকে। ঐ গহ্বরে পলি সঞ্চয় সহজে হবে এবং সেই সঙ্গে পলি উত্তোলনও। চিনে পলি চালনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতির মূল তত্ত্ব হল বর্ষার অতিরিক্ত জল নিয়ন্ত্রণ করে প্রবিষ্ট ও নিষ্ক্রান্ত পলিভারের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করা।

কিছু দিন আগেও অবিভক্ত বাংলায় বহু জলাশয় ছিল। বৃষ্টির জলের একাংশ জমা হত এইসব জলাশয়ে। বর্তমানে এ রাজ্যে বহু জলাশয় অসংস্কৃত অবস্থায় রয়েছে; এদের জলধারণের ক্ষমতাও কমেছে। এইসব জলাশয়ের সংস্কার করা এবং প্রয়োজনে, এদের গভীরতা বাড়ানো দরকার। একটি তথ্যে দেখছি, পশ্চিমবঙ্গে খাল আছে ৭২৪ হাজার হেক্টর এবং পুকুর ২৭৮ হাজার হেক্টর জুড়ে ('ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার ইন ব্রিফ'— ভারত সরকারের সেচ মন্ত্রক, ১৯৮৪-৮৫)। জলাশয়গুলির পাশাপাশি খালগুলির

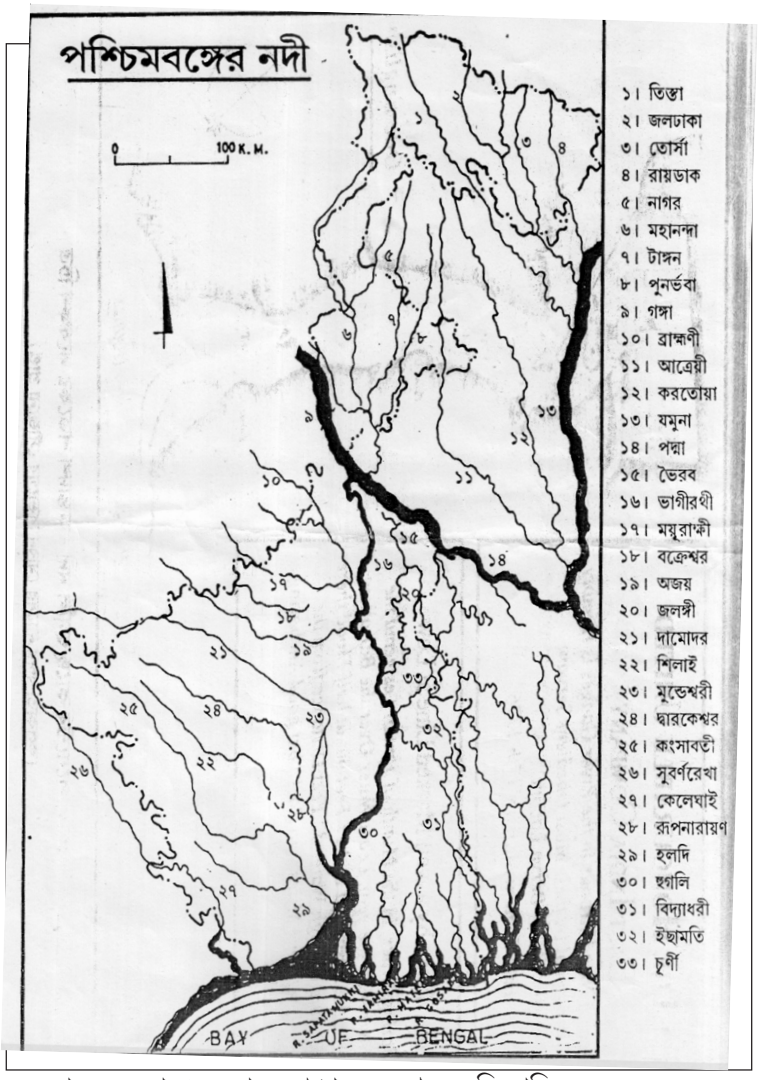

সংস্কারও দরকার। এ কাজে পঞ্চায়েত দপ্তরকে নিয়োজিত করার কথা রাজ্য সরকার ভাবতে পারেন। শুনেছি, কোথাও কোথাও পুষ্করিণী সংস্কারে হাত লাগিয়েছেন পঞ্চায়েত দপ্তর। এ প্রচেষ্টাকে সংহত ও প্রণালীবদ্ধ করতে হবে।

বৃষ্টির অতিরিক্ত জল অপসারণে রাজ্যের সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলগুলিকে অন্য একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিপরীত দিক থেকে আসা জোয়ারের জলে জল নিকাশে বাধার (drainage congestion) সৃষ্টি হয়। এই ধরনের অবরোধ হতে দেখা যায় মূল নদী ও তার উপনদীর সঙ্গমস্থলেও। কাটোয়ার কাছে অজয়-ভাগীরথীর সংযোগস্থলে এমন অবরোধ হতে দেখা গিয়েছে।

বিজ্ঞানাচার্য মেঘনাদ সাহার অভিমত ছিল ভূতল জলধারার নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি করে রেল ও রাস্তার বেড়িবাঁধ (embankment)। এইসব বেড়িবাঁধের পথরেখা নির্ধারিত হয় মূলত গতায়াতের সুগমতা বিচার করে। জল নির্গমের জন্য যে ফাঁক রাখা হয়, দেখা দিয়েছে অধিকাংশক্ষেত্রে তা দ্রুত জল নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত নয়।

প্রসঙ্গত, নদীর পাড় বরাবর যে বাঁধ দেওয়া হয় বন্যার জলকে প্রতিহত করার জন্য, তার সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। এইসব বাঁধ বন্যার জলকে প্রতিহত করতে পারে ঠিকই কিন্তু অন্যদিকে বন্যার পলি মিশ্রিত জল বাঁধে প্রতিরুদ্ধ হয়ে শেষে নদীগর্ভেই জমা হয়। ফলে তাতে নদীর ধারণক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস হতে থাকে।

এ তো গেল বন্যার প্রত্যক্ষগোচর নানা কারণ। অপ্রত্যক্ষ কারণও বন্যা হওয়ার পেছনে আছে। নদীর পরিবর্তমান ভূ-সংস্থান (জিওমরফোলজি), গতিপথের বিচলন, নদীর কূল ও গর্ভের মাটির ক্ষয়, মাটির প্রবেশ্যতা (হাইড্রলিক কনডাক্টিভিটি), মাটিতে সঞ্চিত জলের বাষ্পীভবন ও উদ্ভিদের সাহায্যে তার বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া (ইভাপো-ট্রানস্পিরেশন) ইত্যাদি। এছাড়া আছে গাঙ্গেয় বঙ্গের ভূতত্ত্বীয় অনিশ্চয়তা। পালল অভিক্ষেপ গঠিত বঙ্গভূমি এখনো সুস্থিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিক পূর্ব দিকের তুলনায় দৃঢ়। এজন্য এ রাজ্যের সব নদীর পূর্ব কূলই বেশি ভাঙে। আসলে, এই অঞ্চল একটি ভূতত্ত্বীয় অভিযোজন পর্বের মধ্য দিয়ে চলেছে (অ্যাডাপ্টেশন ফেজ)।

এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ১৩টি কমিটি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার নানা সময়ে গঠন করেছিল। এইসব কমিটির নানা সুপারিশ বিচ্ছিন্নভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রকল্প অর্থের অভাবে এগোচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে। আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে নাকি বাঁধগুলির রক্ষণাবেক্ষণও যথাযথভাবে হচ্ছে না। এখানে উল্লেখ্য, রাজ্যের উচ্চতম ন্যায়ালয় একটি জনস্বার্থ মামলায়

রায় দিতে গিয়ে ২০০৩ সালে একটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে পশ্চিমবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতির সার্বিক পর্যালোচনার জন্য এবং (লেখক ঐ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন)। কমিটির প্রতিবেদন 'রিভিউ অভ ফ্লাড্স্ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' শিরোনামে যথাস্থানে যথাসময়ে পেশ করা হয়েছিল। সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য।

ঐ প্রতিবেদনে বিশেষজ্ঞ কমিটি বলেছিল নদীসংক্রান্ত তথ্যের অসম্পূর্ণতার কথা, সুপারিশ করেছিল পশ্চিমবঙ্গের সব নদীর ঔদক ও পরিলেখ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সেগুলির বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার কথা, সুপারিশ করেছিল অধুনা প্রায় নিষ্ক্রিয় সেচ দপ্তরের অধীন হরিণঘাটার রিভার-রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে ঢেলে সাজার কথা। কমিটি দেখেছিল, বন্যার পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যাপারে প্রস্তুতির অভাব। কমিটির সুপারিশ ছিল, সুষ্ঠু বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিযুক্ত সব প্রতিষ্ঠানকে — যেমন আবহাওয়া দপ্তর, কেন্দ্রীয় জল কমিশন, ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং এজেন্সি, রাজ্যের পঞ্চায়েত, সেচ ও জলপথ এবং নগরোন্নয়ন দপ্তর — সংহত হয়ে কাজ করতে হবে; বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদানে ছেদ পড়লে চলবে না। কমিটি দীর্ঘমেয়াদি বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে বলেছিলেন বন্যানিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আরব্ধ প্রকল্পগুলি দ্রুত শেষ করার কথা এবং সেইসঙ্গে অনারব্ধ প্রকল্পগুলির অবিলম্বে শুরু করার গুরুত্বের কথা।

মনে রাখতে হবে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের মূল নীতি হল বৃষ্টির দরুন তৈরি হওয়া জলপ্রবাহের গতিকে মন্দীভূত করা এবং সেইসঙ্গে মৃৎক্ষয় নিবারণ করাও। কমিটির সুপারিশ ছিল নদীতে আড়াআড়িভাবে ছোট ছোট বাঁধ (ক্রস্ বান্ড) তৈরি করা, যাতে সেচের সুবিধা ছাড়াও এবারের বন্যাকবলিত জেলাগুলির অনার্দ্র মাটিতে আর্দ্রতা বৃদ্ধি হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে তুলনামূলকভাবে বৃষ্টি কম হয়, রৌদ্রের প্রখরতাও বেশি।

বাঁধের জলাধারগুলি থেকে পলি উত্তোলনকে গুরুত্ব দিতে হবে। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকেই কারণ ঐ সব বাঁধের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের হাতে। উত্তোলিত বিপুল পরিমাণ পলি কোথায় ফেলা হবে সেটাও ভাবতে হবে। অবিলম্বে সংস্কার করতে হবে ছোট ছোট খাল-বিল-নদীও। দ্রুত জল অপসারণের জন্য বেড়িবাঁধে রাখা ফাঁকগুলি পর্যাপ্ত কিনা সেটাও দেখা দরকার। মাথায় রাখতে হবে মাটির নিচে জলাধানের (রি-চার্জ) বিষয়টিও।

লোয়ার দামোদর ড্রেনেজ স্কিম, দামোদর নদের ওপর এবং মজা দামোদর ও গাইঘাটা খালের সংযোগস্থলে নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা (রেগুলেটরি ওয়ার্কস্) আশু বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। মাইথন ও পাঞ্চেতে জলাধার সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণও ত্বরান্বিত করতে হবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল— যথাসময়ে বন্যার পূর্বাভাস জানানো। পূর্বাভাস জানানোর পদ্ধতি আধুনিক করে তোলা দরকার এবং সেই সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণও। কেন্দ্রীয় জল কমিশন কিছুদিন আগে তাৎক্ষণিক (রিয়াল টাইম) তথ্য সংগ্রহ, তা যথাস্থানে দ্রুত প্রেরণ এবং সেইসব তথ্য বিশ্লেষণ করে পূর্বাভাস দেওয়ার একটি আধুনিক ব্যবস্থা চালু করেছে। এ ব্যাপারে কৃত্রিম উপগ্রহ-নির্ভর টেলিমেট্রি পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ইন্টারনেটে 'WISDOM' শীর্ষক 'ওয়েব পেজ' থেকে বন্যার পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য www.india-water.com খুললে জানা যাবে। জানা নেই, রাজ্য সরকার এই ব্যবস্থার সুবিধা কাজে লাগাচ্ছে কিনা।

পূর্ণ বন্যা-নিয়ন্ত্রণ কার্যত অসম্ভব; তবে বন্যার প্রাবল্য কমানো অবশ্যই যায় যদি আমরা সবদিক থেকে প্রস্তুত থাকি। নদীর মর্জিকে না বুঝে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। আসল কথা হল, নদীকে কত কম নিয়ন্ত্রণ করে কত বেশি সুবিধা তার থেকে আদায় করা যায় সেটা ভাবা। নদী-নিয়ন্ত্রণের অত্যনুকূল (অপ্টিমাম) সীমা নির্ধারণ করা দুরূহ ঠিকই; কিন্তু তাকে ভালবেসে, তার মর্জি বুঝে তাকে কাজে লাগানো তো যায়! যেমন করতেন আমাদের পূর্বজরা। তাঁরা জানতেন how to live with floods। আমরা এখন নদীকে শাসন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

এই নিবন্ধ শেষ করার মুখে উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সব নদী ফুঁসছে, ৭টি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন, ট্রেন চলাচল বন্ধ। আবার ভয়াল বন্যার ভ্রূকুটি সেখানে। উত্তরবঙ্গে বন্যার কারণ ও সেখানকার নদীর গতি ও প্রকৃতি আলাদা। উত্তরবঙ্গে বন্যাপরিস্থিতির বিশ্লেষণ তাই আলাদাভাবে করতে হবে।

যাই হোক, দক্ষিণবঙ্গে এবারের বন্যা মনুষ্যকৃত কিনা, তা বিচারের ভার পাঠককুলের ওপরই ছেড়ে দিলাম।

সহায়ক পাঠ— Reservoirs and Sedimentation Issues - World Wide of India by G. L. Morris

(Water and Energy Abstracts 2005 - Indian Journals.Com)

উমা

ভালো ডাক্তার, বড় ডাক্তার এবং সাম্প্রতিক স্বাস্থ্যসঙ্কট

ইন্দ্রনীল ঠাকুর

সাম্প্রতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে ডাক্তার-রুগী সম্পর্কের অবনতি, ভুয়ো ডাক্তার, সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসাব্যবস্থার নানান দোষগুণ ইত্যাদি একটি নিত্য সংবাদে পরিণত হয়েছে। প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে ডাক্তাররাও কর্মবিরতিসহ নানান কর্মসূচি নিচ্ছেন। বর্তমান চিকিৎসা-সঙ্কটের নানাবিধ কারণগুলির মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই। সাধারণ মানুষের কিন্তু নানান প্রশ্ন। কে বড় ডাক্তার? কোথায় সঠিক চিকিৎসা পাওয়া যাবে? সরকারি, না বেসরকারি? রাজ্যে, না রাজ্যের বাইরে? ভেলোর, না অ্যাপোলো? জানতে হবে, বড় ডাক্তার হওয়া ব্যাপারটা সত্যিই বড় কঠিন, সঙ্গে দুর্লভও বটে। দক্ষিণমুখে চিকিৎসার একটি সুবিধা এই যে এক ছাতার তলায় বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে চিকিৎসা ও মাস্টার চেকআপের সঙ্গে কন্যাকুমারী, পণ্ডিচেরি অরবিন্দ আশ্রমের মতো জায়গা দর্শন করে একটু আধ্যাত্মিক বাতাস পাওয়া যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আবার সাম্প্রতিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞায় স্পিরিচ্যুয়াল হেল্‌থের কথা উল্লেখ করেছে। প্রথমেই বলে রাখি, একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি নিরপেক্ষভাবেই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। বলতে দ্বিধা নেই, আমার চিকিৎসক জীবনের ১৫ বছরে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই (প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে মেডিকেল কলেজ) কাজ করার সুবাদে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তা থেকেই কিছু বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি মাত্র। প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, একটি দেশ কতটা উন্নত, তা সেই দেশের মানুষের কটি গাড়ি আছে, তা দিয়ে বোঝা যায় না। বরং কটি লোক নিজের গাড়ি থাকা সত্ত্বেও সরকারি পরিবহন ব্যবহার করেন, তাই দিয়ে বোঝা যায়। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। এক সময় এই রাজ্যে চিকিৎসার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মন্ত্রী আমলাসহ বিভিন্ন নামিদামী ব্যক্তিত্বরা রাজ্যে ভিড় করতেন। আর এখন এই রাজ্যের মানুষই নিজেদের স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় দক্ষিণমুখী। এর কারণ কি শুধুমাত্র সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চরম অবনতি? আমার কিন্তু তা মনে হয় না। বিশ্বায়নের ফলে অন্যান্য রাজ্যে চিকিৎসায় প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে বিপুল রোগীর চাপও অন্যতম কারণ বলে আমার মনে হয়। এই অপকেন্দ্রিকতার ব্যাপারটা অত্যন্ত সুচারুভাবে কাজে লাগিয়ে কলকাতায় বাইপাসের ধারে গড়ে উঠেছে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সারি সারি কর্পোরেট হাসপাতাল। সেই সঙ্গে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, চিকিৎসাক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভরতাই শেষ কথা হতে পারে না বা তা প্রয়োগ করলেই বড় ডাক্তার হওয়া যায় না। মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও ভালো ডাক্তার অনেকেই হন কিন্তু বড় চিকিৎসকের ক্ষেত্রে সেটি হল নানাবিধ গুণের সমন্বয়। বরং বলা যায় এই পেশা শুধুমাত্র পড়াশোনাভিত্তিক জ্ঞানের চাইতে আরো অনেক বেশি দাবি করে। রোগের মোকাবিলায় ক্লিনিকাল বিচক্ষণতা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের সামঞ্জস্য না থাকলে ভীষণ মুশকিল। এই সামঞ্জস্য না থাকলে চিকিৎসার খরচ বাড়তে বাধ্য। সঙ্গে রোগীর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রেসক্রিপশন করাটাও বাঞ্ছনীয়। সরকারি ও বেসরকারি দুটি ক্ষেত্রেই এই সামঞ্জস্যের বড় অভাব। বেসরকারি জায়গায় নব্য প্রযুক্তি আছে, যার অভাব সরকারি হাসপাতালে রয়েছে ঠিকই, কিন্তু ক্লিনিক্যাল অ্যাকুমেনের ক্ষেত্রে তা ঠিক উল্টো। চিকিৎসকের অ্যাকুমেন থাকা কিন্তু অপরিহার্য। একজন চিকিৎসকের সাফল্য কিন্তু সেখানেই যে, তিনি কত কম চিকিৎসাজনিত ব্যয়ে একটি রুগীকে তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট পরিণাম দিতে পারছেন। সেখানে সবসময় হয়ত তিনি ব্যয়বহুল আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার না করে ছাত্রজীবনে

শেখা ন্যূনতম খরচের একটি বুদ্ধিদীপ্ত পুরনো বেডসাইড প্রক্রিয়া ব্যবহার করলেন তাঁর কোনো গরিব রোগীর জন্য। হয়ত পুরনো পদ্ধতিটির সাফল্যহার তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু নেই মামার চেয়ে কানা মামা তো ভাল! এটাই চিকিৎসকের সূক্ষ্ম বিচক্ষণতা। এই বিচক্ষণতা কিন্তু বড় ডাক্তার হওয়ার একটি অন্যতম মাপকাঠি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চিকিৎসার ব্যয়ের পুরোটা চিকিৎসকের ইচ্ছাধীন নয়। চিকিৎসক মাসের শেষে কাঙ্ক্ষিত আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা কর্পোরেটের হাতে সবসময় তুলে দিতে না পারলেও লাঞ্চ আওয়ারে অযথা গঞ্জনার সম্মুখীন না করিয়ে কর্পোরেট কর্তাদেরও চিকিৎসকের এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাতে হবে। কোনও ক্ষেত্রেই কিন্তু রোগীর অভাব নেই। কারণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য এখানে অবহেলিত। এ রাজ্যের লোকজন এখানে ভিড় করে চিকিৎসার জন্য। বিভিন্ন সংস্থার মেডিক্লেম পলিসির সঙ্গে এই হাসপাতালগুলো যুক্ত। অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে যেখানে চাহিদার সঙ্গে জোগানের সামঞ্জস্য থাকলে দ্রব্যমূল্য কম হওয়ার কথা। এক্ষেত্রে উলটপুরাণ দেখা যায়। প্রতিযোগিতার বাজারে করে খাওয়ার বিষয়টি গ্রাম-গঞ্জ-মফস্বলের ছোট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে আংশিক সত্য হলেও কর্পোরেট হাসপাতালগুলোর ক্ষেত্রে একদমই প্রযোজ্য নয়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, কর্পোরেট হাসপাতালগুলির ক্যাচমেন্ট এলাকা বিশাল। সরকারি জায়গায় অনেক বেশি সংখ্যক রেফারাল রোগী দেখতে পাওয়ার কারণে একজন চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রখর হওয়ার অনেক বেশি সুযোগ থাকে। আবার এটাও ঠিক যে, অনেক সময় রোগীর এই প্রবল চাপ সঠিক গুণমানযুক্ত পরিষেবা প্রদানের অন্তরায় হয়েও দাঁড়ায়। এভাবেই সমান্তরাল দুটি চিকিৎসা ব্যবস্থার ফারাক প্রকট হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় শুরু হয় মধ্যবিত্তের স্বাস্থ্যসঙ্কট। কারণ তারা না পারে সরকারি হাসপাতালের আউটডোরের বিপুল ভিড়ে লাইন দিতে, না পারে বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসার গগনচুম্বী বিল মেটাতে। এই সুযোগটাই বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট দালালরা নিয়ে থাকে। ঠিক এই জায়গাটিতেই বাজেট হাসপাতাল গড়ার চিন্তাধারাটি গুরুত্ব পায়। যেমন সবজিমাসি বুড়িমার মানবিক হাসপাতাল গড়ে উঠেছে তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে বা বেলুড়ের শ্রমজীবী হাসপাতালে ও শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেন্নাই)-এর কথাও বলা যায়, যা পরিচালিত হচ্ছে কতিপয় ডাক্তারের আন্তরিক সদিচ্ছায় ও সাহচর্যে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির আরও সরকারি ও রাজনৈতিক সাহচর্য পাওয়া উচিত। চিকিৎসকদের রোগীর পরিবারবর্গের সঙ্গে সময় নিয়ে কথা বলা অত্যন্ত জরুরি। সঠিক কাউন্সেলিং করলে ঝামেলা অনেকখানিই এড়ানো যায়। বেসরকারি ক্ষেত্রেও যে সবসময় কোয়ালিটি কাউন্সেলিং হয় আমার অভিজ্ঞতা তা বলে না। আবার একটি খারাপ খবর কীভাবে ব্যক্ত করা যায় ডাক্তারিতে তারও শিক্ষণ জরুরি। আরোগ্য সম্ভাবনা সম্পর্কে চিকিৎসকের যত কম ধন্দ থাকে, ততই ভালো। দুই পক্ষের ধন্দই ঝামেলার সব থেকে বড় কারণ বলে আমার মনে হয়। বাইরের দেশে কিন্তু এই রোগী-চিকিৎসক সম্পর্কটিকে ভীষণ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। আরো একটি ব্যাপার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়, সরকারি হাসপাতালে আন্তর্বিভাগীয় সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো, যাতে রোগীর রেফারাল প্রক্রিয়াটি ঝামেলামুক্ত হয়। রোগীর এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে যেতে কোনো অসুবিধা না হয়। আমাদের দেশে কতজন রোগী হাসপাতালের পরিসংখ্যানগত সাফল্য বিবেচনা করে সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে যান? বেসরকারি হাসপাতালের ক্ষেত্রে অনেকেই আছেন, যাঁরা ডাক্তারের নাম, ডিগ্রি, সাফল্যহার ইত্যাদি ভাল করে না জেনেই শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন দেখে প্রভাবিত হন। ভুয়ো ডাক্তার ঘটনায় তার প্রমাণ তো সদ্যই আমরা পেয়েছি। সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজগুলির অনেক অপ্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও আমার নিকটাত্মীয়দের আমি সরকারি হাসপাতালেই ভর্তি করে থাকি। সুফলও পেয়েছি বার বার। ভুলবেন না বহু রোগী কিন্তু কর্পোরেটে ভর্তি থেকে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়লে তাঁদের একমাত্র ভরসা সরকারি হাসপাতালের আইসিইউ বা মেঝে। এক জায়গায় ভেন্টিলেটর খুলে অন্য জায়গায় ভেন্টিলেটরে সংযোগের কাজটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ তা বোঝা দরকার। ব্যাপারটা এত সহজ নয়। বললেই সরকারি হাসপাতালে একটি আইসিইউ বেড জোগাড় করা মুখের কথা নয়। বিশেষ করে যেখানে রোগী ভর্তির ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক মদত চলে। যে সব রোগের বিশেষ হৈ চৈ করে চিকিৎসা করার অবকাশ চিকিৎসাশাস্ত্রেই নেই সেখানে মেশিনে-মানুষে যুদ্ধ বাধানোর কোনো মানে নেই। তাই একদম সঠিক নির্দেশিকা না থাকলে কোনো রোগীকে ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে ঢুকিয়ে ভেন্টিলেটরে দেওয়া ঠিক

নয়। সহজ ভাষায় ভেন্টিলেটরজনিত কঠিন সংক্রমণগুলি ও তার মোকাবিলার খরচ সম্পর্কে রোগীর পরিজনদের অবগত করা দরকার। ওষুধের বাইরে সেবা বা নার্সিং ব্যাপারটি ক্রমাগত গুরুত্ব হারাচ্ছে যা সত্যিই উদ্বেগের। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এদেশে চিকিৎসা সহ সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় সবথেকে বড় সঙ্কট হল নিজেদের মৌলিক গবেষণার অভাব। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাদা চামড়ার উপর গবেষণালব্ধ ফল থেকে তৈরি করা প্রোটোকল অনুযায়ী চিকিৎসা চালাতে হয় কালো চামড়ার উপর, যাঁদের জেনেটিক গঠন থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি

চিকিৎসক অনেক সময় নানান কারণে প্রোটোকল ভাঙতে বাধ্য হন। মুমূর্ষু রোগীটিকে বাঁচাতে অনেক সময়ই এই প্রোটোকল ভাঙা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় নয়, বরং চিকিৎসকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যয় বলা যায়। কর্পোরেট ব্যবস্থায় এই বিচক্ষণতার কোনো মূল্য নেই।

পর্যন্ত অনেকাংশেই আলাদা। তাই অন্য দেশের তৈরি প্রোটোকলীয় জ্ঞান নিজেদের জ্ঞানের আলোয় প্রতিষ্ঠা না করে প্রয়োগ করা একরকম নির্বিবাদে মেনে নেবারই নামান্তর। চিকিৎসক অনেক সময় নানান কারণে প্রোটোকল ভাঙতে বাধ্য হন। মুমূর্ষু রোগীটিকে বাঁচাতে অনেক সময়ই এই প্রোটোকল ভাঙা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় নয়, বরং চিকিৎসকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যয় বলা যায়। কর্পোরেট ব্যবস্থায় এই বিচক্ষণতার কোনো মূল্য নেই। যে চারটি বিষয় এই ক্রেতাসুরক্ষা আইনের দিনে চিকিৎসকদের মনে রাখতে হবে তা হল– কমিউনিকেশন, ডকুমেন্টেশন. ডকুমেন্টেশন অভ কমিউনিকেশন, কমিউনিকেশন অভ ডকুমেন্টেশন। রোগীর চাপে অনেক সময়ই যা উপেক্ষিত হয়। তাই সরকারের দেখা উচিত, একজন ডাক্তার আউটডোরে সর্বাধিক কত রোগী দেখবেন, তার মাত্রা নির্ধারিত করা। ডাক্তারদেরও তাঁদের পরিবারকে সময় দেওয়ার প্রয়োজন থাকে। সমগ্র ব্যবস্থাটিকে যত দ্রুত ডিজিটালাইজড করা যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। রোগীর পরিজনদেরও হাসপাতাল ব্যবহারে আরও যত্নবান হতে হবে। যত্রতত্র পানের পিক ফেলা বন্ধ করা দিয়ে শুরু করুন। অশিক্ষিত ক্রোধী পরিজনদের দূরে থাকতে বলুন। মদ্যপান প্রতিরোধে আরও সচেতনতা দরকার। অধিকাংশ রোগ-ই দীর্ঘ ধুমপান ও মদ্যপানের সুদূরপ্রসারী ফল। ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের অপ্রতুলতার কারণে যাঁরা ঝামেলা করেন, তাঁরা নিজেদের প্রশ্ন করুন, কটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে আপনি নিজে রক্তদান করেছেন! আরএসবিওয়াই বা ঐ জাতীয় কার্ড থাকলে রোগী ভর্তির সঙ্গে সঙ্গেই তা রেজিস্ট্রেশন করান। ছুটির পরে হৈচৈ করলে হয়রানি বাড়বেই। ভর্তির টিকিটে সঠিকভাবে নাম, বানান বা ঠিকানা না লেখা হলেও হয়রানির শিকার হতে হয়। ল্যাবরেটরি রিপোর্টের ক্ষেত্রেও যত্নবান হওয়া দরকার। সরকারি ক্ষেত্রে অযাচিত পরীক্ষা ল্যাবে পাঠালে তাঁদেরও চাপ বাড়বে, ফলে অনভিপ্রেত রিপোর্ট আসাটা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হবে। রোগীর সুবিধার্থে নানান সরকারি প্রকল্প একসঙ্গে চলছে। রোগীর পরিজন এবং জুনিয়র ডাক্তারদের এগুলির সম্পর্কেও ধন্দ দূর করা দরকার। চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরও ছাত্রদের নির্লোভ হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। সরকারি চাকরিকে আরো আকর্ষণীয় করা ভীষণ দরকার, যাতে ব্রেনড্রেন আটকানো যায়। ভালো গবেষণার সুযোগের আশু প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ডাক্তারি শিক্ষায় মূল্যবোধ শিক্ষকের জীবনদর্শনের মধ্যে প্রতিফলিত হলে বেশ ভাল হয়। কারণ জুনিয়ররা যা দেখবে, তাই শিখবে। তাই বোধহয় স্যার বারবার বলেন যে, 'বুঝলি, ভাল ডাক্তার অনেকেই হয় কিন্তু বড় ডাক্তার সবাই হতে পারে না!' তাহলে কি যাবতীয় সিস্টেম ভাঙতে বসেছে? তবুও আমি আশাবাদী। নইলে নতুন আশার সঞ্চার করে নতুন সিস্টেম চালু হবে কীভাবে?

উমা

বাঁধ বন্যা বিপর্যয়

ফি বছর বর্ষা মানেই বন্যা। বন্যা নিয়ে এর আগে আমাদের দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বন্যা এখনও প্রাসঙ্গিক। তাই সমসময়কে ধরে উৎস মানুষ প্রকাশ করতে চলেছে নতুন সঙ্কলনগ্রন্থ।

হারিয়ে যাওয়া বাংলার ধান ও অর্থনীতি

নন্দগোপাল পাত্র

ভারতীয় উপমহাদেশে যে ধান চাষ হয় তার বৈজ্ঞানিক নাম ওরাইজা স্যাটিভা ইন্ডিকা (Oryza Sativa var, Indica)। এই ধানের আছে অগুন্তি প্রকারভেদ। লম্বা গাছ, খাটো গাছ, শক্ত ডাঁটা, দুর্বল ডাঁটা, রোমশ পাতা, মসৃণ পাতা, সরু ধান, মোটা ধান, লাল, কালো, হলদে, সাদা বা রঙের সুগন্ধী বা গন্ধহীন চাল— কত জাতের ধান যে এদেশে পাওয়া যায় তার সম্পূর্ণ হদিশ এখনো মেলে নি। হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার বিপুল বিচিত্র ধানের সম্ভার। প্রাণবন্ত উর্বরা ধরিত্রীর বুকে নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে পরম্পরাগত কৃষি সংস্কৃতির ধারা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া অগণিত কৃষক ধানের আদিম কোনও জাত থেকে সুদীর্ঘকালের চেষ্টায় সৃষ্টি করেছেন এই সব ধান। যা একেক ধরনের জমিতে ফলনের উপযোগী। জোয়ারের নোনা জলে ধোয়া লবণাক্ত জমিতে ফলন দেয় এমন ধানও যেমন আছে সুন্দরবন অঞ্চলে, তেমনি হিমাঙ্কের চার ডিগ্রি নিচে, তুষারপাতের মধ্যেও দিব্যি ফলন দেয়, এমন ধানও মেলে দার্জিলিং হিমালয়ে। আবার খরা প্রবণ এলাকায় যেখানে সেচের কোনও সুযোগ নেই, সেখানে ঢালু উঁচু জমিতেও বেশ কয়েক জাতের ধানচাষ হয়। দক্ষিণ বাংলার বারোমেসে জলাজমিগুলোতে কয়েক জাতের ধান ফলে, যেগুলোর শিষ ১০ ফুট গভীর জলের উপরিতলের আরো দু ফুট ওপরে আন্দোলিত হয়। এই বাংলার পশ্চিমের জেলাগুলিতে আবার এমন কয়েক জাতের ধান পাওয়া যায়, যা প্রবল হাওয়াতেও ভূমিস্পর্শ করে না।[১] কেরালার সুন্দরী ধানের বৈশিষ্ট্য হল, জলের তলায় এই ধান পাঁচ দিন থাকতে পারে।[২] আদি কৃষককুল যে ধানের নানান জাত বাছাই করেছিলেন, সেটা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিভিন্নতার উপযোগী করে ফসল উৎপাদনের কারণেই নয়, রসনার তৃপ্তিও ছিল একটি অন্যতম কারণ।

ধান থেকে পাওয়া চাল হল ভারতের অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য। সারা পৃথিবীতে যা উৎপাদন ও দানা শস্য রূপে খাদ্য গ্রহণের ভিত্তিতে দ্বিতীয়। ২০১১-১২ উৎপাদন বছরে ভারতে ১০৪.৩২ মিলিয়ন মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হয়েছিল, যা সারা পৃথিবীতে মোট চাল উৎপাদনের ২২.৮১%।[৩] ভারত তথা বাংলায় সুন্দর সরু চালের জন্য সীতাশাল, রূপশাল, বাঁশকাঠি ধান বিখ্যাত। আছে সুস্বাদু ভাতের জন্য কয়া, বকুলফুল, মধুমালতি, ঝিঙেশাল। অপরূপ খৈয়ের জন্য কনকচূড়, বিন্নি, ভাসামানিক, লক্ষ্মীচূড়া। চমৎকার মুড়ির জন্য রঘুশাল, চন্দ্রকান্ত। পরমান্নের উপযোগী ছোটদানার শ্যামা, তুলসী মঞ্জরী, তুলসী মুকুল। দেবভোগ্য সুরভিত চালের জন্য বাসমতী, গোবিন্দভোগ। এই ধানগুলো বাংলারই এবং তালিকা এখানেই শেষ নয়।

বিগত শতকের ষাটের দশকে ভারতে ঘটে-যাওয়া 'সবুজ বিপ্লবে'-র হাত ধরে আন্তর্জাতিক কৃষি ব্যবসায়ীদের আগ্রাসী বিজ্ঞাপন, প্রযুক্তিনির্ভর কৃষিতে ঢালাও সরকারি অনুদান, আর উচ্চ ফলনশীল 'ম্যাজিক' বীজের বাজার দখলের ফলে বেশিরভাগ দেশি, পুরনো জাতের ধান হারিয়ে গেছে, আজও যাচ্ছে। সঠিকভাবে কেউ জানে না, ঠিক কতগুলো জাতের সনাতন ধান আজ সারা দেশে চাষ হচ্ছে। তবে ৮০-র দশকেই ভারতের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি ধানজমিতে দু-তিনটি উচ্চফলনশীল (হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি) জাতের ধানচাষ হত। বর্তমানে আরো বেশি জমি হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটির আওতায় এসে গেছে। উচ্চ ফলনশীল 'ম্যাজিক' বীজ দিয়ে শুরু করে সবুজ বিপ্লবের ঢেউ বিগত ৪৫-৫০ বছরের মধ্যেই হাজার হাজার জাতের ধান একেবারে মুছে দিয়েছে। অযুত বছরের সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা করতে পারে নি।

দেশি ধানের অতুল বৈচিত্র্যের আজ আর সামান্যই অবশিষ্ট আছে। বিলুপ্তপ্রায় ধানের বীজের সন্ধানে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য কৃষি দপ্তর। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশেও সন্ধানে যেতে চায় দপ্তর। নদীয়ার ফুলিয়া এবং হুগলির কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ধানের বীজের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে সাধারণ বীজই বেশি। আছে কিছু সুগন্ধী ধানের বীজও। ম্যানিলায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রে বিভিন্ন দেশের ধানের বীজ সংরক্ষিত রয়েছে। সেখানে বাংলার হারিয়ে যাওয়া ধানের বীজ মেলে কি না,

সেই খোঁজও শুরু করেছে কৃষি দপ্তর। সুগন্ধী চাল ছাড়াও ২০০৮-এ প্রথমবার কালো চাল হয় এমন ধানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ফুলিয়ায়।[৪] ধান-গবেষক অনুপম পালের তত্ত্বাবধানে সেই ধান ফলানো হয়েছিল রাজ্যের কৃষি দপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। কালো রঙের চালে অ্যান্থোসায়ানিন নামে এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ থাকে। যা আসলে এক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এটি হার্ট অ্যাটাক এবং ক্যানসারের প্রবণতা কমায়। এছাড়া কালো চালে ভিটামিন এ, বি, ই, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, উচ্চ প্রোটিন, ফ্যাট ও ডায়াটরি ফাইবার (বিটা গ্লুকানন, পেকটিন ইত্যাদি) বেশি থাকে। এসব কারণের জন্য এই চাল সহজপাচ্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ। কালো চালের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম হওয়ায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী।[৫] সুগন্ধী ও কালো চাল হয় এমন ধানের চাষ করলে একসঙ্গে দু'টি লক্ষ্য পূরণ হবে। প্রথমত, অন্নজীবী বাঙালির রসনা তৃপ্তি হবে। দ্বিতীয়ত বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা যাবে বাংলার হারিয়ে যাওয়া বাণিজ্যলক্ষ্মীকে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীন সংস্থা এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড প্রসেসড ফুড প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা অ্যাপেডা আরব দুনিয়া, জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি করে বাণিজ্যের ভাল সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে।[৪] রাজ্য সরকার ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিকে অ্যাপেডার মাধ্যমে বাংলার সুগন্ধী চাল পাঠিয়েছিল। কলকাতা বিমান বন্দরেও রয়েছে বিক্রির ব্যবস্থা।[২] ঐ সকল রত্ন-বীজ ধানের সংরক্ষণ সহ যত বেশি চাষিদের কাছে পৌঁছবে, তত সমৃদ্ধ হবে বাংলার ধানজমিগুলো। ওরা হারিয়ে দেবে রাসায়নিক শিল্পনির্ভর চাষকে, ফিরিয়ে আনবে লক্ষ্মী পেঁচা, মৌমাছি, গঙ্গা ফড়িং ও কাঁচপোকার দলকে, আর চাষীরা ফলাবেন সোনার ফসল, পাশাপাশি সমৃদ্ধ হবে বাংলার অর্থনীতি।

তথ্যসূত্রঋণ

১। লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি— দেবল দেব, উৎস মানুষ প্রকাশন (২০০০), পৃ. ১।

২। আজকাল পত্রিকা ২৮ মার্চ ২০১৭।

৩। Everyman's Science, Vol. 1.1 No. 3 August '16 September '16, p. 183

৪। আনন্দবাজার পত্রিকা ২২ এপ্রিল ২০১৭।

৫। Black Rice Research, History and Development - Ujjal K. Springer (2016), Chapter 2.

উমা

পড়াশোনা দেখাশোনা

সুগত সিংহ

কথা বলতে কোনও টেকনোলজি লাগে না, কিন্তু লিখতে গেলে লাগে। কিউনিফর্ম, শিলালিপি, স্লেট, চক, প্যাপাইরাস, ভূর্জপত্র, তালপাতা, কাগজ, কলম, ছাপাখানা, টাইপরাইটার, কমপিউটার, স্মার্টফোন সব আসলে ইনফর্মেশন টেকনোলজি বা তথ্যপ্রযুক্তি। প্রাচীন সুমেরীয়রা আজ থেকে ৫০০০ হাজার বছর আগে প্রথম লেখার উদ্ভাবন করে। একদল লোক মাটি মেখে কাদার ট্যাবলেট তৈরি করত। আরেকদল সেই নরম সারফেসে সূক্ষ্ম শলাকা জাতীয় জিনিস দিয়ে কিউনিফর্ম লিপি লিখত। আরেকদল সেটাকে পুড়িয়ে শক্ত করত। মানে বেশ ভাল মতো ডিভিশন অভ লেবার ছিল এবং তাদেরকে কাজ করানোর জন্য রক্তচক্ষু বুরোক্র্যাসি এবং চাবুকের বন্দোবস্ত ছিল। আজকের হিসেবে সেটা একটা ইটভাটি, কিন্তু সেদিনের হিসেবে হেভি ইন্ডাস্ট্রি। শিলালিপি মানে আরেক প্রস্থ লোকজন, আরেকটা কর্মযজ্ঞ। হয় পাথর জোগাড় করে মাপ মতো কেটে বা পাহাড়ের গায়ে তড়পা বেঁধে ঘষে ঘষে মসৃণ করো, তারপর ছেনি বাটালি নিয়ে হইহই রইরই কাণ্ড।

ভাগ্যের ফেরে রবীন্দ্রনাথ যদি সেই জমানায় জন্মাতেন, তো তাঁর আর রবীন্দ্রনাথ হওয়া হত না। কারণ কাগজ নেই, কলম নেই, লিখে কেটেকুটে সংশোধন করার উপায়ও নেই। মাথায় একটা ভাবনা এলে সেটাকে মাথার মধ্যেই পরিণতি দিতে হবে। তারপর চোঙা ধরনের কোনও জিনিস ফুঁকে লিপি লিখিয়েদের ডিক্টেট করতে হবে। একটা ভুল হলে পাথরখণ্ড পাল্টাতে হবে বা অন্য পাহাড়ে যেতে হবে। রবীন্দ্রনাথের যা লেখার পরিমাণ গুদামের পর গুদাম ট্যাবলেট বা পাথরে ভরে যাবে, সেগুলো নাড়াঘাঁটা করার কুলিমজুর, উট, হাতি, ঘোড়া লাগবে বা পাহাড়ের পর পাহাড় গাছ উপড়ে নেড়াবোঁচা শেষ হয়ে যাবে। জীবনানন্দের মতো নিভৃতচারী মানুষ তো ওমুখো হতেনই না। এভাবে সাহিত্য হয় না। তাহলে তখন কী লেখা হত? মূলত ঈশ্বরের বাণী, রাজকীয়

ফরমান এবং আয়ব্যয়ের হিসেব। দুশো লোকের কাছে রাজা কত ফসল পাবেন, এটা দশ বছর বাদে গুলিয়ে যেতে পারে। তাই এগুলোকে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য এত কাণ্ড। সিনাই পর্বতে এক ঝড়জলের রাতে এরকম দুটো পাথরের ট্যাবলেটে লেখা টেন কম্যান্ডমেন্টস বা দশটি নির্দেশ ঈশ্বরের থেকে মোজেস পেয়েছিলেন। সাহিত্য তখন লেখা হত না। বেদ, ইলিয়াড, ওডিসি, রামায়ণ সব মুখে মুখে কম্পোজ হয়েছিল। মনে রাখার সুবিধের জন্য ছন্দ আর সুর ব্যবহার করা হত। অক্ষর চেনার আগে বাচ্চাদের তাই ছন্দে শেখানো হয় অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে। চারণকবি হোমার হার্প বাজিয়ে গেয়ে বেড়াতেন। লবকুশ তাঁর জীবনকথা রামকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন, পড়ে শোনাননি। গল্প তখন বলা হত না, গাওয়া হত। সেটা ছিল একটা পারফর্মেন্স। তাই রামায়ণ মহাভারতে লেখক চরিত্র সম্পর্কে কী ভাবছেন, সেটা প্রায় নেই। তিনি শুধু সংগ্রাহক এবং পারফর্মার। ফিল্ম স্ক্রিপ্টে যেমন ডায়ালগের মধ্যে দিয়ে সব বলতে হয়, মহাকাব্যেও সবটাই প্রায় বৈশম্পায়ন, যুধিষ্ঠির বা দ্রৌপদী উবাচ। জার্মান ভারতবিশারদ মরিস ভিন্টারনিৎস ব্যাপারটা খেয়াল করেছিলেন এবং লিখেছিলেন, মহাভারত যে মূলত উক্তিপ্রধান, তা দিয়ে তার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। উগ্রশ্রবা মূল কাহিনীর বক্তা। মূল কাব্যটিও বৈশম্পায়ন বলে চলেছেন। বৈশম্পায়ন কথিত কাহিনীর মধ্যে অগুন্তি গল্প বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে স্থান পেয়েছে।[১]

কাগজ-কলম আসার পর ঝামেলা কিছুটা কমল। এল পুঁথির যুগ। কিছুটা কারণ মহাভারতের মতো বই একশোটা কপি করতে কতজন লিপিকরের কত দিন লাগতে পারে সহজেই অনুমেয়। লিপিকররা ধর্মীয় সঙ্ঘের কাছের লোক বা হোয়াইট কলার ওয়ার্কারে পরিণত হলেন। কারণ যে কটি পুঁথি এভাবে পাওয়া যেত, সেগুলো মন্দির, মসজিদ, গির্জা বা গুরুগৃহে রাখা থাকত। শিক্ষার্থীদের গুরুগৃহে গিয়ে থাকতে হত। গুরুকুল প্রথার উদ্ভব হল। শুরু হল এজ অফ ওয়ান্ডারিং ইন্টেলেকচুয়্যালস্। বুদ্ধিজীবী হতে হলে তখন পথিক হতে হত। অতীশ দীপঙ্কর পুঁথির সন্ধানে হেঁটে তিব্বতে চলে গিয়েছিলেন। আজকে হলে বইগুলো তাঁর কাছে চলে আসত বা তাঁর বাণী বইয়ের মাধ্যমে সেখানে পৌঁছে যেত। সাধারণ মানুষ বই কী জানতেন না। তাঁরা লিপি চিনতেন না। তাঁরা সেই বাচিক সংস্কৃতিকেই বয়ে নিয়ে চললেন। বেদব্যাস লেখাপড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন না। তাই গণেশকে লিপিকর হতে হয়েছিল। সক্রেটিস মনে করতেন অক্ষর মানুষের স্মৃতিশক্তি কেড়ে নিচ্ছে। তাঁর ছাত্র প্লেটো অবশ্য লেখাকেই অবলম্বন করেছিলেন কিন্তু একটা মাঝামাঝি পথ নিয়েছিলেন। গুরুর সমস্ত কথা ডায়ালগ ফর্মে ধরে রেখেছিলেন।[২] মহম্মদ থেকে রামকৃষ্ণ কেউ লিখতে পড়তে পারতেন না। ভগবান বুদ্ধ, জরাথুষ্ট্র, যিশু হয় নিরক্ষর ছিলেন, নয় লেখাপড়ায় বিশ্বাস করতেন না। এঁদের আমরা শুধু বাণী পাই, স্বহস্তে লিখিত কিছু পাই না। থাকলে তাঁদের ভক্তরা যেন তেন প্রকারে সেটা রক্ষা করতেন। রিভিলেশন, ব্রহ্মজ্ঞান বা নির্বাণলাভ করা আসলে কী, তা লিখে বোঝানো যায় না, ওগুলো অনুভবের ব্যাপার। এই আমি বলছি, এবার তোমরা লিখে নাও, এমন দৃষ্টিভঙ্গিও ওঁদের ছিল না। রামকৃষ্ণেরা নিজেদের মতো বলে যেতেন, মহেন্দ্র গুপ্তরা নিজেদের গরজে সেটা লিখে রাখতেন। শিক্ষিত মানেই স্বাক্ষর এই এলিটিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিটা বই আসার পর গেড়ে বসেছে। নিরক্ষর মানুষও গভীর জ্ঞান এবং অনুভবের অধিকারী হতে পারেন।

১৪৫৫ সালে গুটেনবার্গ ছাপাখানা থেকে প্রথম বই ছেপে বেরোয়। এই প্রথম পাহাড়, গুহা, মন্দির, মসজিদ, গুরুগৃহ ছেড়ে বই লোকের ঘরে ঘরে ঢুকে গেল। স্কুল, কলেজ বাড়তে লাগল। মনে রাখার জন্য সুর ছন্দ দরকার হল না। ভুলে গেলে বই খুলে দেখে নেওয়ার সুবিধে এল। গদ্যভাষা বাড়তে শুরু করল। জন্ম হল উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ এবং আধুনিক কবিতার। বুর্জোয়ারা মানুষকে অনেক জ্বালিয়েছে। কিন্তু আজকের অর্থে সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি, তা তারাই আমাদের উপহার দিয়েছে। কার্ল মার্ক্স বুর্জোয়াদের অর্থলোলুপতাকে তুলোধোনা করেও তাঁদের বৈপ্লবিক ভূমিকাকে সেলাম জানিয়েছিলেন। ছাপাখানা বুর্জোয়া ইনভেন্টরদের বৈপ্লবিক অবদান। ছাপাখানা না এলে রেনেসাঁর সুফল ইউরোপে ছড়াত না, রিফর্মেশন, রেস্টোরেশন, এনলাইটেনমেন্ট, ফরাসী বিপ্লব, অক্টোবর বিপ্লব কিছুই হত না। ভিক্টর হুগো বলেছিলেন, ওই এক ছাপাখানার ধাক্কায় ইউরোপ মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগে ঢুকে গেল।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য, ব্রিটেন থেকে যেসব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা রাজকর্মচারি হিসেবে কাজ করার জন্য আসছিল, তাদের এদেশীয় ভাষা এবং সংস্কৃতিতে শিক্ষিত করে তোলা। ওই কলেজে বই জোগান দেওয়ার জন্য ৮০

শতাংশ মোবাইল পেনিট্রেশন আছে। সেটা যদি কলমের মতো সস্তা হয়ে যায়, চিরুনির মতো ব্যাক পকেটে ঢুকে যায় তো বহুল ব্যবহৃত বস্তুতে পরিণত হবে। অক্ষরের থেকে শব্দ এবং দৃশ্য অনেক বেশি মানুষ বুঝতে পারে। অডিওভিসুয়াল বাহিত শিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষর কিন্তু শিক্ষিত মানুষের উদয় হবে। শ্রীরামপুরে একদল পাদ্রি উইলিয়ম কেরির উদ্যোগে বাংলা গদ্যে বই ছাপা শুরু করলেন। সেটা দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছতে লাগল। ভারতচন্দ্র আর রামপ্রসাদের কাব্যযুগ পেরিয়ে বাংলায় গদ্যের যুগ এসে গেল। ছাপা বই না হলে আমরা রামকৃষ্ণকে হয়ত পেতাম কারণ তিনি একান্তভাবে বাচিক সংস্কৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ কাউকেই পেতাম না। তাঁদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে ছিল বই। তথাকথিত বাংলার নবজাগরণের শিরদাঁড়া হচ্ছে ছাপাখানা।

নব্বইয়ের দশক থেকে ইন্টারনেট এসে গেল। এল ই-বই। হাজার হোক বা লাখ, ছাপা বইয়ের সংখ্যা নির্দিষ্ট। গাছপোঁতা, সেটাকে বড় করা, তার থেকে মণ্ড বানিয়ে কাগজ বানানো, ছাপানো, গুদামজাত করা, লরি, ট্রেন বা প্লেনে এদিক-ওদিক পাঠাতে যে বিপুল খরচা, সেটা প্রতি কপি বইয়ের সঙ্গে জুড়ে যায়। ই-বই অসীম সংখ্যায় কপি হতে পারে। যে কোনও প্রান্তে পাঠানো যেতে পারে। একদম নিখরচায়। অর্থনীতির যে নিয়মে রেকর্ড, ক্যাসেট, সেলুলয়েড অদৃশ্য হল, সে পথে কাগজের উৎপাদনও বন্ধ হবে। বড়জোর তার প্রয়োগ থাকবে প্যাকেজিং ধাঁচের কিছু ইন্ডাস্ট্রিতে। লেখাপড়া হবে পিসি, স্মার্ট ফোন বা আরও সস্তার কোনও ডিজিটাল ডিভাইসে।

সাধারণ মানুষ মূলত মেল, ব্লগ, মেসেজিং এবং চ্যাটের মাধ্যমে নেটে লেখালেখি করেন। চ্যাট করা মানে আমি কি-বোর্ডে একটা কথা লিখলাম, দুনিয়ার যে প্রান্তে থাকুন আপনার কমপিউটার বা মোবাইল স্ক্রিনে সেটা ভেসে উঠল। আপনি তৎক্ষণাৎ উত্তর লিখলেন, সেটা আমার স্ক্রিনে চলে এল। ভার্চুয়াল চ্যাটরুমগুলোতে একসঙ্গে একাধিক ইউজার ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজনীতি, দর্শন, অর্থনীতি, শিল্পসাহিত্য নিয়ে আলোচনা বা নিখাদ প্রেমও করতে পারেন। অ্যাদ্দিন আমরা সামনাসামনি বা টেলিফোনে কথা বলতাম বা চিঠি, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতাম। কিন্তু রিয়েল টাইমে এইভাবে লিখে কথা বলাটা মানুষের ভাষা ঐতিহ্যে ছিল না। মন্তব্য মানে সাহিত্য নয়। কিন্তু স্মার্টফোনের ছোট কি-বোর্ডে দ্রুত আঙুল চালানোর চাপে নিত্যনতুন শব্দ, চিহ্ন, ইডিওগ্রাম, পিক্টোগ্রাম, ইমোটিকন, ইমোজি, অন্যান্য ভাষা ইংরেজি হরফে লেখার ফলে সিনট্যাক্স ও গ্রামার নিয়ে অন্য ধরনের সৃজনশীলতা দেখা যাচ্ছে।

মা কতটা অসুস্থ সেটা বোঝাতে কিছুদিন আগে টোকিওপ্রবাসী ভাইকে মেল করতে হত। তারপর স্কাইপে সরাসরি দেখিয়ে দেওয়া হত, সঙ্গে থাকত মার বা আমার বক্তব্য। পদার্থবিদ্যার জটিল তত্ত্ব পড়ে ততটা বোঝা যায় না। ইউটিউবে গ্রাফিক্স বা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে বুঝতে সুবিধে হয়। কেউ আর পড়ে-লিখে শিখবে না, শিখবে দেখে-শুনে। সমসাময়িক হয়েও পিথাগোরাস, কনফুসিয়াস আর ভগবান বুদ্ধ কেউ কারও কথা জানতেন না। আজকে হলে তাঁরা স্কাইপ কনফারেন্সে বিতর্কের ঝড় তুলতেন। আমরা তাতে উঁকিঝুঁকি মেরে বা নেট মারফত মহম্মদ বা রামকৃষ্ণকে দেখে এবং বচন শুনে শিক্ষিত হয়ে যেতাম। এবার স্কুলকলেজের সঙ্কীর্ণ পাঠ্যক্রমের বাইরে মানুষ স্বশিক্ষিত হয়ে উঠবে। স্টিভ জোবস, বিল গেটস, সের্গেই ব্রিন, ল্যারি পেজ সবাই তো স্কুলছুট! তবু এঁরাই আজকে গেম চেঞ্জার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা নয়। এই স্বপ্নটা প্রথম দেখেছিলেন এইচ জি ওয়েলস। তাঁর মনে হয়েছিল, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে যেভাবে জ্ঞানের আহরণ এবং বিতরণ হচ্ছে, তা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া, লাইব্রেরি আর ইউনিভার্সিটিগুলো দ্বারা বা বইয়ের দ্বারা জ্ঞানভাণ্ডারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কী করে ভেঙে দেওয়া যায়। মানুষের সমস্ত জ্ঞানকে কী করে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে রাখা যায় এবং সবার হাতের তালুতে নিয়ে আসা যায়। এই রক্ষণশীল শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি এমন একটি ব্যবস্থা কী করে তৈরি করা যায়, যার মাধ্যমে মানুষ সরাসরি সমস্ত জ্ঞানের নাগাল পেয়ে যাবে। ইন্টারনেট তাঁর পক্ষে ভেবে ওঠা সম্ভব ছিল না। তিরিশের দশকের শেষে তিনি তাঁর ওয়ার্ল্ড ব্রেন গ্রন্থে একটা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্গানের কথা কল্পনা করেছিলেন, যার মাধ্যমে সমস্ত জ্ঞান একটা সহজ সূচিতে বিন্যস্ত হবে। তার মাধ্যমেই সমস্ত জ্ঞানের আহরণ ও বিতরণ যে কেউ করতে পারবে।[৩]

কিন্তু এর ফলে কি ডিজিটাল হ্যাভস এবং ডিজিটাল হ্যাভ নটস এই দুটো শ্রেণী তৈরি হচ্ছে না? গরিব মানুষেরা ডিভাইসগুলো পাবে কী করে? ২০০০ সালে ইরানি ফিল্মমেকার সমিরা মখমলবাফ ব্ল্যাকবোর্ড ছবিটির জন্য কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড নিতে গিয়ে একটি যুগান্তকারী বক্তৃতা দেন। তিনি বলেছিলেন, ক্যামেরা

আস্তে আস্তে পেনের মতো হাল্কা, সহজলভ্য এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি হয়ে যাবে। এমনটাও হতে পারে কনট্যাক্ট লেন্সের মতোই তা চোখের কর্নিয়ায় ঢুকে যাবে।[৪] এখনই ভারতে শেষে মানুষের অক্ষরজ্ঞান লুপ্ত হবে। শুধু অক্ষর চেনা আছে বলে স্বাক্ষর লোকেদের দ্বারা নিরক্ষরদের দাবিয়ে রাখা বন্ধ হবে। অক্ষরের প্রয়োগ থাকবে শুধু $E = mc^2$-এর মতো বিমূর্ত চর্চায়। ওগুলো সাধারণ মানুষ এখনও বোঝে না, তখনও বুঝবে না। এমনকি আইনস্টাইনের অধিকাংশ ভাবনা প্রথম এসেছিল ইমেজের মাধ্যমে। তারপর সেটাকে তিনি অঙ্ক দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন।[৫]

অক্ষর ও বই আমাদের অনেক দিয়েছে। কিন্তু শব্দের পর শব্দ, লাইনের পর লাইন, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ, সাদা পাতায় কালো দাগ, আমাদের একটা একমাত্রিক (ওয়ান ডাইমেনশনাল) জগতে ঢুকিয়ে দেয়। আদিবাসীরা অক্ষর-সভ্যতা মেনে নিতে পারেননি বলে সারা পৃথিবীতে তাঁদের নিজস্ব কোনও লিপি নেই। অক্ষর আসার আগে মানুষ হাজার হাজার বছর দৃশ্য, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধময় মাল্টি-ডাইমেনশনাল জগতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেছে। মাল্টিমিডিয়া তাকে আবার সেই জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হচ্ছে। বরং তার পরিধি আরও বাড়ছে। কারণ তখন মানুষ ছিল যূথে বা কৌমে বিচ্ছিন্ন। আজকে নেটের দৌলতে সবাই সংযুক্ত।

তথ্যসূচি ঃ

১) Winternitz, Moriz. A History of Indian Literature, Vol 1, Part 1, Third Edition 1962, University of Calcutta, p. 284.

২) Innis, Harold Adams. Empire and Communications, 1st Print 1950. Project Gutenberg Canada ebook. Section 68.

৩) Wells, H.G. The Idea of a Permanent World Encyclopaedia, World Brain, August 1937. A Project Gutenberg of Australia ebook. http://gutenburg.net.au/ebooks13/13o373.htm#ch3

৪) Makhmalbaff, Samira. Digital Revolution and Future of cinema. http://www.iranchamber.com/cinema/articles/digital_revolution_future_cinema.php#sthash.cWo1G4S4.dpuf

৫) Norton, Jhon D. How did Einstein Think. http://www.pitt.edu/~jdnorton/Goodies/Einstein_think/)

মহম্মদের কথা জানি না। তবে রামকৃষ্ণ নিরক্ষর ছিলেন, এটি একটি বহুল প্রচলিত এবং সম্ভবত তাঁর গরিমা বাড়াতে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে প্রচারিত ভুল তথ্য। বালক গদাধর গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের পাঠশালার নিয়মিত ছাত্র ছিলেন। স্বামী সারদানন্দ লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-য় লেখা হয়েছে- 'পাঠশালে যাইয়া গদাধরের শিক্ষা মন্দ অগ্রসর হইতে লাগিল না। সে অল্পকালের মধ্যেই সমানভাবে পড়িতে এবং লিখিতে সমর্থ হইল।... মাতৃভাষায় লিখিত মুদ্রিত গ্রন্থসকল পড়িতে এবং লিখিতে বিশেষ পটু হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ রামায়ণ, মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থসকল সে এখন ভক্তির সহিত এমন সুন্দরভাবে পাঠ করিত যে, লোকে তচ্ছ্রবণে মুগ্ধ হইত। গ্রামের সরলচিত্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা সেজন্য তাহার মুখে ঐসকল গ্রন্থ শ্রবণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত। বালকও তাহাদিগের তৃপ্তিসম্পাদনে কখনও পরাঙ্মুখ হইত না। ঐ রূপে সীতানাথ পাইন, মধু যুগী প্রভৃতি অনেকে ঐজন্য তাহাকে নিজ নিজ বাটীতে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইত এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার মুখে প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবোপাখ্যান অথবা রামায়ণ-মহাভারতাদি হইতে অন্য কোন উপাখ্যান ভক্তিভরে শ্রবণ করিত।' এই বইতেই দেখি, 'তারকেশ্বর মহাদেবের প্রকট হইবার কথা, যোগাদ্যার পালা, বন-বিষ্ণুপুরের মদনমোহনজীর উপাখ্যান প্রভৃতি অনেক দেব-দেবীর অলৌকিক চরিত্র এবং সাধুভক্তদিগের নিকট স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিবার বৃত্তান্ত সময়ে সময়ে গদাধরের শ্রবণগোচর হইত। বালক নিজ শ্রুতিধরত্বগুণে ঐসকল শুনিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখিত এবং ঐরূপ উপাখ্যানের মুদ্রিত গ্রন্থ বা পুঁথি পাইলে কখন কখন উহা স্বহস্তে লিখিয়াও রাখিত। গদাধরের স্বহস্তলিখিত রামকৃষ্ণায়ণ পুঁথি, যোগাদ্যার পালা, সুবাহুর পালা প্রভৃতি কামারপুকুরের বাটীতে অনুসন্ধানে দেখিতে পাইয়া ঐ বিষয়ে জানিতে পারিয়াছিলাম।'

পুনঃ– রামকৃষ্ণ কথামৃতম বলে যা পাওয়া যায়, তার কতটা রামকৃষ্ণের আর কতটা শ্রীম-র তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ কিছু সময়ের জন্য গিয়ে সরাসরি শুনে বা অপরের মুখ থেকে শুনে পরে লিখতেন। বিনা টেপরেকর্ডার শোনা সেই লেখায় মনের মাধুরী মিশে যাওয়াই স্বাভাবিক। ভক্তিরসের আতিশয্যে যা আমরা বুঝি না বা বুঝেও বুঝতে চাই না।– সম্পাদক

তিন দশকের নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন আজ এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে

অরুণ পাল

(গত ২৭ জুলাই, ২০১৭ মেধা পাটেকার নর্মদার প্রশ্নে আবার অনশন শুরু করলেন এবং যথারীতি তাঁকে গ্রেপ্তার করে জোর করে খাওয়ানো হল। 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' এই তিনটি শব্দের সঙ্গে মেধা পাটেকার নামটি একাকার হয়ে গেছে। 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' কী ও কেন? এই প্রসঙ্গে নীচের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হল।)

ধ্বংসাত্মক উন্নয়নের বিরুদ্ধে, নর্মদা নদীর ওপর বড় বড় বাঁধ তৈরির বিরুদ্ধে, নর্মদাপারের আদিবাসী, কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী মানুষের একটানা ৩২ বছরের শান্তি পূর্ণ গণ-আন্দোলন, যা 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' নামে পরিচিত, তা এক ইতিহাস রচনা করেছে। গত শতকের ৮০-র দশকের শুরুতে মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট– এই তিনটি রাজ্য জুড়ে বিস্তৃত নর্মদা উপত্যকায় ১৩১২ কিমি দীর্ঘ নর্মদা নদীর ওপর ৩০০০টি ছোট বাঁধ, ১৩৫টি মাঝারি এবং ৩০টি বড় বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় দুটি বাঁধ হল নর্মদা সাগর এবং সর্দার সরোবর। এই বিশাল প্রকল্পের ফলে ৩৭ হাজার হেক্টর কৃষিজমি জলের তলায় তলিয়ে যাবে, লাখ লাখ কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী ও আদিবাসী মানুষ তাঁদের জমি হারাবেন ও উচ্ছেদ হবেন। হারিয়ে যাবে বন ও অসংখ্য বন্যপ্রাণী। ধ্বংস হবে বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য, তলিয়ে যাবে প্রাচীন মন্দির ও নগর, ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পরিবেশ। এই প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করলেন নর্মদা তীরের মানুষ। তাঁরা বললেন, একটা নদীর স্বাভাবিকভাবে বয়ে চলার অধিকার কোনভাবেই ধ্বংস করা যায় না। কোনও একটা নদীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নদীর পারের অধিবাসীদের। তাঁদের উচ্ছেদ করে নদী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়াটা অনৈতিক। উত্তরাখণ্ড আদালত সম্প্রতি একটি রায়ে জানিয়েছে, গঙ্গা ও যমুনা নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখা নদীগুলির রয়েছে মানুষের মতো বয়ে চলার অধিকার। অস্ট্রেলিয়ার সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে বলা হয়েছে, কোনো একটা নদীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নদীর পারের অধিবাসীদের। নর্মদা নদী ও তার দু- পাশের পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে নর্মদাপারের অধিবাসীদের হাজার হাজার বছর ধরে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এভাবে ধ্বংস করে দেওয়াটা এক নৈতিক অপরাধ।

নর্মদা নদীর এই ভয়াবহ সর্বগ্রাসী প্রকল্প সম্পর্কে খোঁজ নিতে এগিয়ে এলেন বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন। ১৯৮৫ সালে শুরু হল নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (এনবিএ)। যার নেতৃত্বে ছিলেন মেধা পাটেকার, বাবা আমতে, বি ডি শর্মা প্রমুখ। পরে এগিয়ে এলেন রামস্বামী আয়ার, কুলদীপ নায়ার, স্বামী অগ্নিবেশ ও অন্যান্যরা। সর্দার সরোবর প্রকল্পের (এসএসপি) জন্য প্রথমে ধার্য করা হয়েছিল ৪২০০ কোটি টাকা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধার্য টাকার পরিমাণ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। ১৯৮৫ সালের মে মাসে বিশ্বব্যাঙ্ক এসএসপি-র জন্য ৪৫ কোটি মার্কিন ডলার অনুমোদন করে। ১৯৮৭-র জুনে ভারত সরকারের পরিবেশ মন্ত্রক এসএসপি-কে ছাড়পত্র দেয়। অক্টোবরে যোজনা কমিশন ছাড়পত্র দেওয়ার পর কাজ শুরু হয়।

এখানে গত ৩২ বছরের নর্মদা আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা হাজির করছি।

১৯৮৫ সালে মেধা পাটেকার ও বসুধা দিগম্বর মহারাষ্ট্রের সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলি ঘুরতে থাকেন। ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৈরি হয় নর্মদা ধরংগ্রস্ত (Dharangrast) সমিতি। ১৯৮৭-র ২১ অক্টোবর গুজরাটের কেবাডিয়াতে বিশাল জমায়েত হয়। ১৯৮৯-র ফেব্রুয়ারিতে বাঁধ এলাকায় জমায়েত হয় ১০ হাজার লোকের। ওই বছর ২৫০টি সংগঠনের উদ্যোগে মধ্যপ্রদেশের হর্ষদে ৫০ হাজার মানুষের জমায়েতে স্লোগান ওঠে 'বিনাশ নয়, বিকাশ চাই'। ১৯৯০-র মে মাসে দিল্লিতে আস্তে আস্তে পেনের মতো হাল্কা, সহজলভ্য এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি হয়ে যাবে। এমনটাও হতে পারে কনট্যাক্ট লেন্সের মতোই তা চোখের কর্নিয়ায় ঢুকে

যাবে।[৪] এখনই ভারতে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে নর্মদা উপত্যকার ১৫০০ মানুষ ধর্নায় বসেন। ৯০-এর ডিসেম্বর থেকে ৯১-এর জানুয়ারি ৬ হাজারের ওপর নারী-পুরুষ বাঁধ এলাকার উদ্দেশে যাত্রা করেন। ৭ জানুয়ারি গুজরাত সীমান্তে তাঁদের আটকে দেওয়া হয়। মেধা পাটেকার সহ অন্যান্যরা অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু করেন। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্পের পুনর্বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। অনশন তুলে নেওয়া হয়। ১৯৯৩-এর ৩০ মার্চ বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্প থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। ১৯৯৪-র মে মাসে এনবিএ সুপ্রিম কোর্টে এসএসপি-র বিরুদ্ধে রিট পিটিশন দাখিল করে। ডিসেম্বরে ভূপালে ধর্না শুরু হয়। ২৫ দিনের অনশনের পর মধ্যপ্রদেশ সরকার প্রকল্পের কাজ বন্ধ করতে রাজি হয়। ১৯৯৬-এর ডিসেম্বরে কাসরাওয়াদায় ৫০ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে বিকল্প জলনীতির দাবিতে সমাবেশ হয়। ১৯৯৭-এর অক্টোবরে মণ্ডলেশ্বরে মহেশ্বর বাঁধের কারণে উচ্ছেদ হওয়া ১২ হাজার মানুষের জমায়েত। ১৯৯৮-এর জানুয়ারিতে ২৫ হাজার মানুষ মহেশ্বর বাঁধ এলাকা দখল করে এবং ৬ জন কর্মী অনশনে বসেন। শেষ পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশ সরকার কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। দুটি জার্মান কোম্পানি মহেশ্বর প্রকল্প থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। এনবিএ-র সংগঠিত প্রতিরোধ এবং বড় বাঁধের ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচারের ফলে সারা বিশ্ব জুড়ে বড় বাঁধের ব্যাপারে একটা বিতর্ক তৈরি হয়। এর দরুন ১৯৯৮-এর মে মাসে আন্তর্জাতিক স্তরে তৈরি হয় ওয়ার্ল্ড কমিশন অন ড্যামস্, যার অন্যতম সদস্য মেধা পাটেকার। ১৯৯৯-এর এপ্রিলে ২০০০ কর্মী মানবাধিকার যাত্রা শুরু করে মুম্বই, বারওয়ানি, কেভাদিয়া ছুঁয়ে দিল্লিতে উপস্থিত হন। ২০০০ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাস জুড়ে বারাওয়ানি ও ভূপালে বিক্ষোভ ও গ্রেপ্তারবরণ, দিল্লি অভিযান, গণশুনানি, কেন্দ্রীয় সরকারের জলসম্পদ মন্ত্রকের অফিসে অভিযান। ২০০১-এর এপ্রিলে নর্মদা আন্দোলনে শিশুদের নিয়ে শুরু হয় 'জীবনযাত্রা'। ভারতের বিভিন্ন অংশ ছুঁয়ে দিল্লিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতিকে উপত্যকায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে আসে শিশুরা। ২০০৪-এর জানুয়ারিতে এসএসপি-র উচ্চতা ১১০ মিটার উঁচু করার বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের মন্ত্রণালয়ের বাইরে ধর্না ও অনশন। ২০০৬ সালের এপ্রিলে দিল্লিতে মেধা পাটেকার, ভগবতী বেহান সহ অন্যরা এসএসপি-র উচ্চতা বেআইনিভাবে ১১০ মিটার থেকে ১২২ মিটার করার বিরুদ্ধে ২১ দিন ধরে অনশন করেন। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রীসহ একদল মন্ত্রী নর্মদা উপত্যকায় গিয়ে নর্মদা পারের মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা যে রিপোর্ট জমা দেন, তাতে তাঁরা পুনর্বাসন নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতির উল্লেখ করেন। ২০১০ সালের ১০-১৬ এপ্রিল পক্ষকালব্যাপী জীবন অধিকার যাত্রা সংগঠিত করেন এসএসপি-র দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত দু হাজারেরও বেশি পরিবার।

এনবিএ কেবল সঙ্ঘর্ষই জারি রাখে নি, শঙ্কর গুহ নিয়োগীর নির্মাণের আদর্শকে সামনে রেখে গড়ে তুলেছে 'নর্মদা নবনির্মাণ অভিযান' আন্দোলন। এনবিএ শিশুদের জন্য বিকল্প শিক্ষা চালু করেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে জীবনশালা (স্কুল অভ লাইফ)। ১৯৯১ সালের জুন মাসে চিমালখেড়ি ও নিমগাভন নামে দুটি গ্রামে প্রথম জীবনশালা চালু হয়। তারপর অন্যান্য গ্রামেও সেটা ছড়িয়ে পড়ে। এইসব শিশুরা প্রকৃত অর্থেই নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সন্তান। এনবিএ স্থানীয় ভাষায় (Pavri) স্কুলবই ছাপিয়েছে। শুধু শিক্ষাই নয়, বিভিন্ন গ্রামে ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলেছে এনবিএ, জলে ডুবে যাওয়া গ্রামে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছে।

স্বাধীনোত্তর ভারতে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী গণ-আন্দোলন, যা আজ ৩২ বছর ধরে চলছে, সেই আন্দোলন আজ এক আক্রমণের মুখোমুখি। গত ১৭ জুন, ২০১৭ কেন্দ্রীয় সরকারের জলসম্পদ মন্ত্রক এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, নর্মদা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (নর্মদা কন্ট্রোল অথরিটি, এনসিএ) নর্মদা নদীর ওপর নির্মিত সর্দার সরোবর বাঁধের সমস্ত দরজা (দুটি বাদে) বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে বাঁধের ১৩৮.৬৮ মিটার উচ্চতায় রিজার্ভারের যে জলধারণ ক্ষমতা রয়েছে সেই মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হবে। এই অতিরিক্ত জমা জল ব্যবহারের জন্য যে খালের পরিকাঠামো তৈরির কথা ছিল তাও এখনও পর্যন্ত অসম্পূর্ণ। এর ফলে একমাত্র মধ্যপ্রদেশেই নর্মদা পারের প্রায় ১৯২টি গ্রাম এবং একটি গঞ্জের প্রায় ৪০ হাজার পরিবারের ন্যূনতম আড়াই লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হবেন। এই অধিবাসীরা দীর্ঘ সময় ধরে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন। 'নর্মদা ওয়াটার ডিসপিউট ট্রাইব্যুনাল' নির্দেশ দিয়েছিল পুনর্বাসন ছাড়া একজন মানুষকেও উচ্ছেদ করা চলবে না। সুপ্রিম কোর্ট তার সাম্প্রতিক একটি আদেশে একই কথা বলেছে। কিন্তু এনসিএ সুপ্রিম কোর্ট ও ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অমান্য করে এক অমানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এক অভূতপূর্ব মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে এনসিএ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা জানাচ্ছে, বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল এই গেটগুলি বন্ধ করে দিলে

এনসিএ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা জানাচ্ছে, বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল এই গেটগুলি বন্ধ করে দিলে মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের নর্মদাপারের লক্ষ লক্ষ আদিবাসী ও কৃষিজীবী মানুষ জলের তলায় তলিয়ে যাবে। দুর্ভাগ্য, প্রচারমাধ্যমও সরকারের এই মিথ্যা প্রচারকে সমর্থন করে যাচ্ছে। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যম নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের গায়ে অনবরত কালি ছিটিয়ে যাচ্ছে। তারা তোতাপাখির মতো বলে যাচ্ছে, এই আন্দোলন উন্নয়ন বিরোধী, দেশের স্বার্থ বিরোধী।

নর্মদা কন্ট্রোল অথরিটির সাম্প্রতিক এই জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সামনে এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এন বি এ-র সংগঠকরা, নদীর পারের মানুষেরা এক জীবনপণ লড়াইয়ের অঙ্গীকার করেছেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রয়োজনে প্রত্যেকে জলসমাধিতে যাবেন। **উ মা**

বইমেলায় উৎস মানুষ-এর নতুন বই

আহরণ

বিভিন্ন মনীষীর যুক্তিবাদ-নির্ভর যে সব লেখা পত্রিকার পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তারই নির্বাচিত কিছু লেখার সঙ্কলন। যে লেখা ভাবাবে, সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থানঃ পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন **নম্বরঃ** ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

গৌরী লঙ্কেশ

এই হত্যা আমরা মানি না, মানব না

পূরবী ঘোষ

নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, যুক্তিবাদী কন্নড় সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশের স্পষ্ট কথা বলার অধিকার, যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হল বন্দুকের সাহায্যে। কিছু অযৌক্তিক, কাপুরুষ, উগ্র জাতীয়তাবাদী মানুষ বন্দুকের সাহায্যে নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন করে সরিয়ে দিল গৌরীকে; যে গৌরী সাংবাদিক, যুক্তিবাদী লেখক বাবার স্নেহচ্ছায়ায় বেড়ে উঠেছিলেন। ফলে তাঁর বয়স যত বাড়ছিল, ততই পরিণত হয়ে উঠছিল তাঁর যুক্তিবাদী মন, ক্ষুরধার হয়ে উঠছিল তাঁর লেখনী। আর তাই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী বারবার ঝলসে উঠেছে। ঘটনার দিন রাতেও চলতি সপ্তাহের পত্রিকা সম্পাদনার কাজ সেরে বাড়িতে ফিরেই তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এইভাবেই কী বন্ধ করা যাবে প্রতিবাদকে? প্রতিবাদী কলম কেড়ে নিলেই যদি প্রতিবাদ বন্ধ হয়ে যেত, তাহলে নরেন্দ্র দাভলকার, গোবিন্দ পানসার, এম এম কালবুর্গিকে থামিয়ে দেওয়ার পরে গৌরীর প্রতিবাদ ঝলসাত না। বন্দুকবাজ হিন্দুত্ববাদীদের মনে রাখতেই হবে, ভয় দেখিয়ে, বন্দী করে, গায়ের জোরে সত্যিকে চাপা দেওয়া কখনও যায় নি, যাবে না। আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের মুক্তমনা ব্লগার অভিজিৎ রায়ের কলম বন্ধ করার পর সে দেশে প্রতিবাদী কলম থেমে যায় নি। পৃথিবীর ইতিহাস বলে, যেখানে অন্যায়, সেখানে প্রতিরোধ, আর যেখানে প্রতিরোধ সেখানে জয় অবশ্যম্ভাবী।

তাই গৌরীর কলম থামিয়ে দিলেও তাঁর চিন্তা ও আদর্শকে থামিয়ে দেওয়া যাবে না। আজ নয় কাল, গৌরী নয় উমা আবার কলম ধরবে। সাম্প্রদায়িকতার শিকড় উপড়ে বিশ্বাস ও ভালবাসার চারা বসাবার কথা বলবে। অন্যায়কারী বন্দুকধারীদের বন্দুক তারা কেড়ে নেবে কলমের জোরে। **উ মা**

কালের প্রভাবে বিপন্ন শঙ্খশিল্প

অলোককুমার বিশ্বাস

নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন, আদিম মানুষ প্রাকৃতিক শক্তি, বৃক্ষ ইত্যাদি পুজোর সঙ্গে সঙ্গে যৌনাঙ্গের রূপক পুজোও শুরু করেন। কারণ তাঁদের কাছে মানুষের জন্ম একটা বড় রহস্য ছিল। সৃষ্টির মূলে ছিল পুরুষ আর প্রকৃতি, তারই প্রতীক হয়ে উঠেছিল লিঙ্গ ও যোনি। এর নানা প্রতীককে তাঁরা পুজো করতে শুরু করেন। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। এর প্রভাবে একদিকে যেমন শিবলিঙ্গ আসে, অন্যদিকে যোনি। কামরূপ-কামাখ্যায় সতীর যোনি-ছাপ এখনও পূজিত। চেহারায় সাদৃশ্যের কারণে স্ত্রী লিঙ্গের প্রতীক হিসাবে আসে কড়ি, শাঁখ ইত্যাদিও। শালগ্রাম বা নারায়ণশিলার গায়েও থাকে শঙ্খচিহ্ন। এগুলো ক্রমশ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে ওঠে। নারায়ণের চার হাতের একটিতে শাঁখকে দেখি। শাঁখ থেকে তৈরি শাঁখাও হয়ে ওঠে মাঙ্গলিক চিহ্ন। আধুনিক শিক্ষিত নারীর কাছে শাঁখা-সিঁদুর গুরুত্বহীন হয়ে পড়ায় এখন আর তার আলঙ্কারিক ব্যবহারও কমে গেছে। ফলে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত অসংখ্য মানুষের জীবন-জীবিকাও আজ বিপন্ন। লেখক শাঁখশিল্পের সেই বিপন্ন ছবিই তুলে ধরেছেন।— **সম্পাদক**

লোকশিল্পের ধারায় শঙ্খশিল্প একটি অত্যন্ত প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য শাখা। শঙ্খ হল গ্যাসট্রোপোডা শ্রেণীর একটি সামুদ্রিক প্রাণী, যার বৈজ্ঞানিক নাম — Turbinellapyrum। ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নামক রাসায়নিক যৌগের শক্ত খোলা দিয়ে শাঁখের মাংসল শরীরটা ঢাকা থাকে। প্রায় দু হাজার বছর আগে শঙ্খশিল্পের উদ্ভব বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। ভারতে শঙ্খশিল্পের উদ্ভব ঘটেছিল দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। কালক্রমে পূর্ব ভারতের ঢাকা শহরই হয়ে ওঠে এ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। ঢাকা ছাড়াও পূর্ব ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলে শঙ্খশিল্পের কেন্দ্র ছিল বলে পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করেছেন। এই শিল্পকে কেন্দ্র করে অতীতে দক্ষিণ ভারত এবং পরের দিকে পূর্ব ভারতের ঢাকা, বরিশাল, বগুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, রংপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে এক বিশেষ শিল্পীসমাজ বিকশিত হয়েছিল। ঢাকা শহরের পর এই শিল্পের সমাবেশ ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার জিৎপুর ও বাজিৎপুর অঞ্চলে। কারিগরি শিল্পের চলমানতায় শঙ্খশিল্প দক্ষিণ ভারত থেকে মুর্শিদাবাদে হঠাৎ একদিনে চলে আসে নি। শিল্পের দীর্ঘ পথের অভিবাসন কয়েক শত বছর ধরে ঘটেছে। এই অভিবাসনেও ছিল বৈচিত্র্য। সুদূর দক্ষিণ থেকে পূর্ব ভারতে বিস্তার ঘটতে অভিবাসন পথেই কেটে গেছে কয়েকশো বছর। এই শিল্পায়নে প্রযুক্তির ব্যবহার হাজার বছরেও খুব বেশি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয় নি। অতি সম্প্রতি কিছুটা পরিবর্তনের ছোঁয়া অবশ্য লেগেছে।

প্রাচীন যুগের তামিল সাহিত্যকর্মে শঙ্খশিল্পের উল্লেখ দেখে জেমস হরলে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন যে, তামিল অঞ্চলে খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রথম থেকেই এ শিল্পের অস্তিত্ব ছিল।[১]

শঙ্খশিল্পের এই হাজার মাইলের অভিগমনের পথ প্রশস্ত ছিল না। প্রাচীনকাল থেকেই পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন বন্দর ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সম্ভবত এই শিল্পের সঙ্গে বাঙালি বণিকদেরও পরিচয় থাকতে পারে। যদিও এই সময় বাংলার উল্লেখযোগ্য বন্দরশহর ছিল তাম্রলিপ্ত। শঙ্খশিল্পের অভিগমনে তাম্রলিপ্ত বন্দর বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বলে মনে করা হয়। অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খশিল্পও এখানে বিকশিত হয়েছিল। তাম্রলিপ্ত সপ্তম শতাব্দীর শেষদিক পর্যন্ত বিখ্যাত বন্দর শহর ছিল। সপ্তম শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে সরস্বতী সরে আসছে বলে ধরা যেতে পারে, কারণ হিসাবে তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতনও ওই সময় শুরু হয়েছিল।[২]

সপ্তগ্রাম যে তাম্রলিপ্তের পতনের পর প্রধান বাণিজ্যিক

কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে তার প্রমাণ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। চৈতন্যর সমসাময়িক বাসুদেব ঘোষ তাঁর 'করচাতে' সপ্তগ্রামের বণিকদের উপরে একটি অধ্যায় লিখেছেন। বহু ধরনের অধিবাসী সপ্তগ্রামে বাস করত, যার মধ্যে ছিল কবিরাজ, তাঁতি, নাপিত, প্রায় সব ধরনের পেশার লোক, দোকানদার, বণিক, ব্যবসায়ী।[৩] সম্ভবত শাঁখারিগণেরও অস্তিত্ব এখানে ছিল।

অভিগমনের রাস্তা ধরে শাঁখারি কারিগর ও বণিকদেরও গমন ঘটেছে। সুদূর দক্ষিণ ভারত থেকে তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্ত থেকে সপ্তগ্রাম। আবার ১৫৩০ সাল নাগাদ সপ্তগ্রামের পতন শুরু হলে তাদের অভিগমন আবার নতুন শহরের উদ্দেশে শুরু হয়। সপ্তগ্রামের বণিককুল একসময় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ওই সব ছোট ছোট শহরে বসবাস করতে শুরু করেন। সপ্তগ্রাম ছেড়ে যাবার ফলে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ, হুগলি, ভবানীপুর ইত্যাদি অনেক শহরে গড়ে ওঠে এবং শঙ্খবণিকগণ ও শাঁখারি কারিগরগণ স্রোতের অভিমুখে ছড়িয়ে পড়েন।[৪] এইসব নতুন শহর ও শহরতলিতে তাঁদের আস্তানা গড়ে ওঠে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ঢাকা মোগল রাজধানী হয়ে যায় সুবা বাংলার। তখন থেকেই ঢাকার উত্থান ধরা যেতে পারে। যদিও আবুল ফজলের আকবরনামাতে জমিদারের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধের বৃত্তান্তের মধ্যে কয়েকবার ঢাকার উল্লেখ করেছেন। যাই হোক সপ্তগ্রামের পর ঢাকা শহর গড়ে ওঠে। এবং শাঁখারিগণ ঢাকা শহরে চলে যান। শিপ্রা সরকার তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন— তামিলনাড়ু, দাক্ষিণাত্য এবং গুজরাটের পরেই শঙ্খশিল্প সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করে ঢাকা শহরে। পরবর্তীকালে ঢাকাই হয়ে ওঠে ভারতবর্ষের শঙ্খশিল্পের প্রধান কেন্দ্র।[৫] কী কারণে, কোথা থেকে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে শঙ্খশিল্প কেন্দ্রীভূত হল তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন জেমস হরনেল ১৯১২ সালে।[৬]

দীনেশচন্দ্র সেন ঢাকার শাঁখারিদের প্রসঙ্গে বলেন যে, 'ঢাকার শাঁখারি বাজারে যে সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পী বাস করেন, তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা কোন দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলা যায় না। তাঁহাদের মেয়েদের বর্ণ এত ফরসা ও মুখের গড়ন এরূপ যে, তাঁহারা খাঁটি বাংলাদেশের লোক বলিয়া মনে হইত না। তাঁহারা যে বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতেন, তাহাও কতকটা বিদেশী ভাষার মত। কলহের সময়ে তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা কিছুতেই বাঙ্গলা বলিয়া মনে হইত না।' দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সংশয়ের তেমন কিছু নেই।[৭] সুতরাং শাঁখারিদের অভিবাসন যে বাংলা প্রদেশের বাইরে থেকে বাংলাতে হয়েছিল তার প্রমাণ বিভিন্ন গ্রন্থে স্পষ্ট।

পনের থেকে ষোল শতকে প্রতিষ্ঠিত মুকসুদাবাদ বা মুখসুদাবাদ নামে পরিচিত গঙ্গার পূর্বপাড়ে অবস্থিত শহরে বাংলার প্রাদেশিক রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্র ১৭০৪ সালে ঢাকা থেকে সরিয়ে এনেছিলেন বাংলার দেওয়ান মুর্শিদ আলি খাঁ। পরবর্তী সময়ে তাঁর নামেই শহরের নাম হয়েছে মুর্শিদাবাদ। ঢাকা থেকে রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্র এখানে স্থানান্তরিত হবার পর এই অঞ্চলের গুরুত্ব বেড়ে যায়।[৮] সে সময় অন্যান্য কুটিরশিল্পের মতো শঙ্খশিল্পের অভিগমন ঘটে। মুর্শিদাবাদের জিৎপুর গ্রামে শঙ্খশিল্প চারশো বছরের পুরনো বলে এই গ্রামের শঙ্খশিল্পী কারিগরগণ মনে করেন। ভৈরব নদীর তীরে জিৎপুর এবং শিয়ালমারি নদীর তীরে বাজিৎপুরের অবস্থান। ঔপনিবেশিক যুগে ভৈরব নদীপথ বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করত। কারণ কলকাতা থেকে হুগলি-ভাগীরথী নদী হয়ে ভৈরবের স্রোত ধরে পদ্মা হয়ে ঢাকা যাবার কথা বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তাই নদীপথের গুরুত্বও জিৎপুরে শঙ্খশিল্পের মৌরসিপাট্টার কারণ।

শাঁখার সামাজিক গুরুত্বঃ শাঁখা প্রধানত হিন্দু বিবাহিতা মেয়েরা মাঙ্গলিক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করেন। হিন্দু মতে যে নারীর স্বামী বেঁচে আছেন, তাঁকে সিঁদুর, আলতা, লোহা, টিপ প্রভৃতির মতো শাঁখাও পরতে হয়। বাংলা ভাষার একটি প্রাচীন ছড়ায় শঙ্খশিল্পের গুরুত্বের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়— 'টঙ্কা ভেঙে শঙ্খ দিলাম কানে সদন কড়ি।' এই মাঙ্গলিক চিহ্নগুলি প্রাচীন আর্যদের শাস্ত্রে ছিল না। প্রাচীনকালে আর্য বিবাহে কন্যা সাদা কাপড় পরত, গো-রোচনা দিয়ে পাড়ে হংসমিথুন আঁকা থাকত, গয়না বেশিরভাগই ফুলের হত। এখনও গুজরাটে বিবাহের পোশাক সাদা এবং অলঙ্কার সব ফুলের। লাল রঙের মাঙ্গলিক অনুষঙ্গ চীন এবং পূর্ব এশিয়া অঞ্চলেই দেখা যায়। শাঁখা ভাঙা অমঙ্গলের। এমনকি ভেঙে গেছে এই কথাটিও বলা চলে না। বলতে হয় বেড়ে গেছে। এক সময় শাঁখারিগণ শাঁখা নিজেরাই উৎপাদন করতেন এবং গ্রামে গ্রামে ফেরি করতেন। বাড়িতে এসে মা-ঠাকুরমাদের হাতে শাঁখা পরিয়ে দিতেন এবং স্বামী ও সংসারের মঙ্গল কামনায় আশীর্বাদ করতেন। তাঁদের বিশেষ সম্মানও করা হত। শাঁখা ও শঙ্খের তৈরি পণ্য মৃতের সমাধিতে পূর্বে ব্যবহার

হত। বর্তমানেও শবদেহে শাঁখা দেবার প্রচলন আছে। বর্তমানে বিশ্বায়নে বাজারীকরণের ফলে শাঁখারিদের আর গ্রামের পথে শাঁখা বিক্রি করতে দেখা যায় না।

শাঁখা উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ঃ মহাজনের ঘরে বস্তাবন্দি কাঁচা শঙ্খ থেকে কারুকার্যমণ্ডিত শঙ্খের উদ্ভব পর্যন্ত বেশ কয়েকটি স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। যে সব কারিগর এই কাজ করে থাকেন তাঁরা বিভিন্ন নামে পরিচিত। বিভিন্ন ধরনের উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার যে কোনো শিল্পকে কৌশলগত উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারে। কিন্তু শঙ্খশিল্পের সেই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আগমন ঘটেছে স্বাধীনতার পরে। যদিও মুর্শিদাবাদের শাঁখারিদের কাছে যন্ত্রের আগমন ঘটেছে ১৯৯৫-এর পরে। শাঁখারিদের, বিশেষত তাঁদের মেয়েদের ধবধবে শ্বেতবর্ণ শাঁখ কাটবার এক ধরনের অদ্ভুত লোহার করাত এবং অপরাপর যন্ত্র, শাঁখা কাটার সেই একঘেঁয়ে শব্দ, যা নিয়ে তামিল কবি তাঁর সমালোচককে খ্রিঃ পূঃ কোনো এক শতাব্দীতে ঠাট্টা করেছিলেন।[৯]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খশিল্পে শ্লথগতি আসে। একসময় এই কারবার ধ্বংসের মুখে পড়তে বসেছিল। তখন হাত করাতে শঙ্খ কাটা হত। এই করাতের আকার ছিল গোল আর চওড়া। দু পাশে দুটো করে হাতল। নীচে দাঁত থাকত। এই দাঁতের এমন বৈশিষ্ট ছিল যে, করাত চালালে দুই দিকে ধার থাকাতে দু দিকেই কাটত। এইজন্য প্রবাদ চালু ছিলু ছিল যে, 'শাঁখের করাতে আসতে কাটে, যেতে কাটে'। এই করাতে কাজ করতে অনেক পরিশ্রমে সামান্য কাজ হত। মজুরি পোষাত না। উৎপাদনও ছিল মন্থরগতি সম্পন্ন।

শঙ্খশিল্পের জন্য শঙ্খ ছাড়াও আর যে সব ট্র্যাডিশনাল উপকরণ প্রয়োজন, তা হত গোটা শঙ্খ থেকে প্রাথমিক ছিলতোলো কাটার জন্য শাঁখের করাত। শঙ্খবলয়গুলোকে অলঙ্কৃত করার জন্য একটি তেপায়া কাঠের টুল, দু-চারটি বিভিন্ন ওজনের ও আকৃতির হাতুড়ি, নরুণ, কুড়া, বিলুনি, একাধার, উকো প্রভৃতি যন্ত্রপাতি। এগুলিকে যন্ত্র না বলে কৃৎকৌশল বলাই ভাল। শঙ্খের বহিরাবরণ পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা হয় হাইড্রোক্লেরিড অ্যাসিড, অলঙ্করণ ও পোকায় খাওয়া ছিদ্র ভরাটের জন্য নাইট্রিক অ্যাসিড ও জিঙ্ক পাউডার এবং বিভিন্ন ভাঙা অংশ জোড়া লাগানোর জন্য গালা। শঙ্খশিল্পীদের কাজের জন্য প্রয়োজন হয় একটি বাঁশের খুঁটি বা খুটল, এ খুঁটির সাত ইঞ্চি থাকে মাটির উপর আর মাটির নীচে থাকে আট ইঞ্চি। প্রয়োজন হয় একটি কাঠের পিঠলা— যাতে পিঠ ঠেকিয়ে কারিগররা কাজ করে। কাঠের চাকা, কুরা, পাটের তৈরি চট। প্রতিজনের ১৪ গিরা, তেলের বাটি, ন্যাকড়া, শঙ্খের গুঁড়ো ইত্যাদি। নারকেলের তেল ও শঙ্খের গুঁড়োর মিশ্রণ বিশেষ প্রয়োজনে কাজে লাগানো হয়, বিশেষ করে শঙ্খ বলয়গুলিতে অলঙ্করণের সময়। উল্লেখ্য যে, প্রাচীন বয়ন পদ্ধতিতে পাট থেকে যে চট তৈরি হত, তা কাজের সময় শাঁখারিরা দেহের সম্মুখভাবে পরত। বর্তমানকালে তৈরি চট ব্যবহৃত হলেও প্রাচীন রীতি অনুযায়ী তার নাম এখনও টাট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে শঙ্খ থেকে শঙ্খবলয় তৈরি হয় আর যে সব কারিগর এই কাজ করেন তাঁদের বলা হয়—

কান্তাইদারঃ প্রাথমিক পর্যায়ে বস্তাবন্দি কাঁচামাল বস্তা থেকে ঢেলে শঙ্খের লেজের মতো অংশটি ভেঙে শঙ্খের মধ্যের নোংরা পরিষ্কার করা হয়। কাজ যাঁরা করেন তাঁদের বলা হয় কান্তাইদার। এই কাজকে 'কুরা' দেওয়া বলা হয়। শঙ্খ সংগ্রহ করার প্রথম কাজ হল 'কুরা' দিয়ে শঙ্খের মুখের বর্ধিতাংশ ভাঙা, এর নাম 'সংকাটা' বা 'পোনাকাটা'। 'কুরা' বলতে এক পাশে হাতল লাগানো লোহার হাতুড়ি। দুই ধরনের 'কুরা' বা হাতুড়ি ব্যবহার হয়— 'চোখাকুরা' এবং 'খেতাকুরা'। মুখচোখা কুরার নাম চোখাকুরা, মুখভোঁতা কুরা হল খেতাকুরা। উভয় প্রকার কুরা দিয়ে পিটিয়ে 'গ্যারা' বের করা হয়, অর্থাৎ মুখের বর্ধিতাংশ ভেঙে ফেলা হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী কুরা দেওয়া পদ্ধতির কোনো উন্নতি হয় নি।

মাঝারদারঃ কান্তাইদার শঙ্খ পরিষ্কার বা 'কুরা' দেওয়ার পরের কাজ হল শাঁখের করাত বা করাতের পরিবর্তে অধুনা গোলাকার বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে শাঁখের মুখের অংশ কেটে ফেলে দেওয়া। একে বলে 'মাজার দেওয়া'। মাজারের পরের ধাপ 'ঝাপানি' দেওয়া। ঝাপানির মাধ্যমে শাঁখের কাটা অংশ পাটায় ঘষে চ্যাপ্টা করা হয়, মসৃন করার জন্য। এরপর ঠিক করা হয় ওটা থেকে কতগুলি শাঁখা বের করা সম্ভব হবে। করাত দিয়ে শাঁখাগুলোকে কেটে কেটে বের করা হয়। সাধারণত একটা পরিমাণ মাপের শঙ্খ থেকে ২ থেকে ৪টা শাঁখা বের করা যায়। কখনো বা তার থেকে বেশিও। শাঁখের করাত দিয়ে শাঁখা কাটা বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। করাতি নামক কারিগর এই কাজ করতেন। বর্তমানে যন্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে। শাঁখ কাটার সময় জলের ধারা চলতে থাকে, যাতে যন্ত্র গরম হয়ে শাঁখা ভেঙে না যায়। যন্ত্রের

উদ্ভব শঙ্খশিল্পকে গতি দিয়েছে।

ঝাপাইদারঙ্খ শাঁখ থেকে কয়েকটি বলয় বের করার পর তা মসৃণ করার জন্য ব্যবহৃত কয়েক প্রকারের রেত বা ফাইল। এগুলো হল— চারফালি রেত, গোলাকৃতি রেত, মাগুর-পিঠা (হাফ রাউন্ড) রেত, চ্যাপ্টা রেত প্রভৃতি। এগুলো দিয়ে ঘষে-মেজে শাঁখার ভেতরের দিক মসৃণ করা হয়। এছাড়া থাকে একটি যন্ত্র, যার নাম 'বুলি'। দেখতে ইস্পাতের সরু বাটালির মতো। 'বুলি'র শেষপ্রান্তে থাকে ডিম্বাকৃতি কাঠের হাতল, আর অগ্রভাগে থাকে কলমকাটা। হাতের সাহায্যে কলম-কাটায় চাপ দিয়ে খোদাই করে শাঁখার উপর নকশা তোলা হয়। হাতুড়ি পিটিয়ে নকশা করা হয় না, কেন না তাতে শঙ্খবলয় ভেঙে যাবার সম্ভাবনা। শাঁখা ছেঁদা করতে ব্যবহার করা হয় দেরাল বা বিশেষ ধরনের ড্রিল। বলয়গুলো ঝুলিয়ে রেখে কাজ করার জন্য বাঁশের চাঁচ দিয়ে নির্মাণ করা হয় ইংরেজি 'A' বর্ণের মতো একটা 'বাড়ি'। এইভাবে সমগ্র কাজ করেন যে কারিগর তাঁর নাম ঝাপাইদার।

শঙ্খচিরঙ্খ মেশিনে যিনি চুড়ি বা শাঁখা বের করেন তিনি শাঁখচির। একটি বড় শাঁখ থেকে ৫ থেকে ৬ জোড়া শাঁখা বেরোয়। দোছাই, তোরাখা, চাইপেটি, চোপাট, কাঠি, কোলকাঠি, ছালি প্রভৃতি এই জাতীয় চুড়ির নাম। প্রতি শঙ্খ থেকে দোছাই, চোপাট ও ছালি বের হয়। এদের মধ্যে চোপাট উৎকৃষ্ট। চোপাট থেকে মকরমুখ শাঁখা তৈরি হয়।

পেঠেল বা কারিগরঙ্খ গোটা শাঁখ থেকে শাঁখা কেটে বের করার পর এগুলো ভিতর এবং বাইরের দিক মসৃণ করার প্রক্রিয়া চলে। ভিতরের দিক মসৃণ করার জন্য সলই কাঠের দণ্ডের সাহায্যে ঘষা হয়। বাইরের দিকটা পাথরে ঘষা হয়। মসৃণ শাঁখাটিকে লোহার রেত দিয়ে নকশা করার জন্য নকশাকারের কাছে পাঠানো হয়। নকশা করার পর মোম, নাইট্রিক অ্যাসিড ও জিঙ্ক পাউডারের দ্রবণের সাহায্যে শাঁখাকে সূক্ষ্মভাবে মসৃণ করা হয়। একই দ্রবণের সাহায্যে ফাটা বা পোকায় খাওয়া অংশসমূহও ভরাট করা হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম পুটিং দেওয়া।

কাঁচামালঙ্খ শঙ্খ সমুদ্রের গভীর থেকে সংগ্রহ করেন ডুবুরিরা। জেমন হরনেল তাঁর স্যাক্রেড চ্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মাদ্রাজ ফিশারি রিপোর্টে বলেছেন, এই দক্ষ ডুবুরিগণ আরবীয় মুসলিম। তারা এই কাজে যুক্ত হয়ে ভারতের মেয়ে বিয়ে করে এখানেই স্থায়ীভাবে বসতি গেড়েছেন। একজন দিনে ১-২টোর বেশি শঙ্খ সংগ্রহ করতে পারেন না। বর্তমানে এর উৎপাদন বেশি হয় কন্যাকুমারি, শ্রীলঙ্কা ও আন্দামানে। অস্ট্রেলিয়া থেকেও শঙ্খ আমদানি করা হয়। আটলান্টিক সাগরের শঙ্খ উন্নত মানের বলে জানিয়েছেন বিশ্বনাথ পাল। তবে তিতকুটি, কন্যাকুমারী, রামেশ্বরী, পাটি, পিনা, জিআরপি, দোআনি, শ্রীলঙ্কা, সালামত, ধলাশাখা এগুলিও উন্নত মানের এবং কাজের। মুর্শিদাবাদের জিৎপুর বা বাজিৎপুরের কারিগরগণ কলকাতার কলুটোলা ও বাগবাজার মার্কেট থেকে কাঁচা শঙ্খ আমদানি করেন। তবে বর্তমানে জিৎপুর বাজারে বহিরাগত কিছু মহাজন কাঁচামালের ব্যবসা শুরু করেছেন। কাঁচামালের দাম দিন দিন বেড়ে চলেছে। ২৫ বস্তার মূল্য ১৯৭৫ সালে ছিল ১২৫ টাকা, ২০০৪-এ দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৫০০০ টাকা।[১১] বর্তমানে সাত থেকে আট হাজার। ২০০৪ সালে সুনামির ফলে শঙ্খের জীবনচক্রের পরিবর্তন ঘটেছে। বালি চাপা পড়ে মৃত্যু ঘটেছে। উৎকৃষ্ট মানের শঙ্খের উৎপাদন কমে গেছে। দামও বেড়েছে বিপুল।

উৎপাদিত পণ্যঙ্খ প্রাথমিকভাবে তৈরি হয় শাঁখা। বিভিন্ন ধরনের নকশা থেকে নামের বিভিন্নতা। যেমন— টোপা বা টেপা শাঁখা, বরফি টোপা শাঁখা, পান পাতা শাঁখা, প্রদীপ শাঁখা, ফুল বা ফুলি শাঁখা, ধানশিষ শাঁখা, পাতাগোলা শাঁখা, বেলগোলা শাঁখা, মণিপুরি শাঁখা, ক্রসফুল শাঁখা প্রভৃতি। সোনাবাঁধানো শাঁখার দাম আলাদা। এছাড়াও শঙ্খের অন্যান্য উৎপাদন বিশেষভাবে এই শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। শঙ্খশিল্প দক্ষিণ ভারতকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল, কারণ কাঁচামাল পর্যাপ্ত মিলত দক্ষিণের সমুদ্রগুলিতে। শঙ্খকে কেন্দ্র করে অনুসারী শিল্পও গড়ে ওঠে। বিশেষ করে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার, ধূপকাঠি তৈরি, শঙ্খের সাদাগুঁড়োর চুন, প্রসাধনী সামগ্রী ইত্যাদি। তবে জিৎপুর বা বাজিৎপুরে শঙ্খের থেকে শাঁখা ছাড়া আনুষঙ্গিক উৎপাদন নেই বললেই চলে। শাঁখের কোনো অংশই ফেলা যায় না। শাঁখার মাপে অংশ কেটে নিয়ে বাকিটুকু দিয়ে অন্যান্য কাজ হয়। আংটি, দুল, গয়না, পেপার ওয়েট, খেলনা বা শৌখিন দ্রব্য।[১২] মুর্শিদাবাদে অবশ্য শাঁখা ছাড়া অন্য কোনও পণ্য তৈরি হয় না। বছর কুড়ি আগে কিছু আদিবাসী মহিলা শঙ্খের পরিত্যক্ত অংশ কিনে পুড়িয়ে চুন তৈরি করত, যা বাজারে খাবার চুন হিসেবে বিক্রি হত। শঙ্খের গুঁড়ো মুখের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর জন্য ব্যবহার হত। বর্তমানে বিভিন্ন নামী কোম্পানির প্রসাধনী বাজারে এসে যাওয়ায় শাঁখের গুঁড়োও আর বিক্রি হয় না।

কারিগরদের আয়ঃ জিৎপুর ও বাজিৎপুর গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের জীবন-জীবিকার একমাত্র উৎস শঙ্খবলয়।

কান্তাইদারঃ জিৎপুর গ্রামে ২৫ জন কান্তাইদার আছেন। একজন ৫০ পিসের বস্তার জন্য পান ১০০ টাকা, ছোট শঙ্খের ক্ষেত্রে ৩৫ পিসের বস্তা পিছু ৭০ টাকা। একজন কান্তাইদার দিনে ৩০০-৪০০ টাকার কাজ করতে পারেন। যদিও প্রত্যেকদিন কাজ থাকে না। সেক্ষেত্রে আয় কিছুটা হলেও কম হয়।

মাঝারদারঃ মাঝারদাররা ১০০টি শঙ্খপিছু পান ৭০-৮০ টাকা। সিজনে দিনে ৩০০-৪০০ টাকা রোজগার করতে পারেন। তবে এক সিজনে ১০- ১২ দিনের বেশি কাজ থাকে না। জিৎপুর গ্রামের মাঝারদার আছেন ৩০-৪০ জন।

ঝাপাইদারঃ একজন ঝাপাইদার দিনে ১৫০ টাকার মতো কাজ করতে পারেন। জিৎপুর গ্রামে ঝাপাইদারের সংখ্যা ২৫-৩৫ জন।

শঙ্খচিরঃ শঙ্খচির দিনে ৮০০-১০০০ পিস শাঁখা কাটতে পারেন। মেশিন আসার ফলে যাঁরা পুরনো তাঁদের কাজ কমে গেছে। মেশিনের জন্য প্রতিদিন প্রত্যেক শ্রমিকের কাজ থাকে না, কারণ উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে একদিনেই সম্ভব। শঙ্খচির প্রতিদিন পিস প্রতি ৫০ পয়সা অর্থাৎ দিনে কাজ থাকলে প্রতিদিন ৫০০ টাকার উপরে আয় করে থাকেন। কিন্তু প্রতিদিন এই কাজ হয় না।

শঙ্খশিল্পীঃ যে সব শিল্পী শাঁখার উপর বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য করে থাকেন, তাঁরা শঙ্খশিল্পী। তাঁদের পারিশ্রমিক অন্যদের তুলনায় বেশি। নকশার ভিত্তিতে ওঁরা মজুরি পান। একজন মকরমুখ শিল্পী দিনে ২০০- ৩০০ টাকা আয় করতে পারেন। তবে বেশিরভাগ শিল্পীই বর্তমানে মেশিনের সাহায্যে হাত ঘুরিয়ে বিভিন্ন নকশা করে থাকেন।

মহাজন শ্রেণীর ভূমিকাঃ ঔপনিবেশিক যুগে এই শিল্পে কারিগরশ্রেণী ছিল একাধারে উৎপাদক ও বিক্রেতা। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যন্ত্রের আগমনে উৎপাদন পদ্ধতিই পাল্টে গেল। আগে যেসব মহাজন ছিল তারা কারিগরের অনুমতিতে বিভিন্ন ধরনের কাজের অর্ডার নিত, যন্ত্রের আগমনে শিল্পের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। কারিগর শ্রেণী আর উৎপাদনে নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রকাশ করতে পারে না। মহাজন সম্পূর্ণরূপে নিজেদের মতো করে কারিগরদের কাজের বরাত দেয়, কি ধরনের নকশা হবে তার নির্দেশ দেয়। শিল্পসত্ত্বার আর কোনও মূল্য এখন বাণিজ্যিক জগতে নেই।

সরকারি সাহায্যঃ সরকারি উদাসীনতা এ শিল্পকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জিৎপুর গ্রামে ১৯৬৮ সালের আগে শঙ্খশিল্পীদের নিয়ে কনসেন্স মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড নামে একটি সমবায় গড়ে উঠেছিল। জীর্ণ অফিসঘরটির এখনো জিৎপুরে আছে। কিন্তু সোসাইটির কোনো কাজ নেই। যদিও এই সোসাইটির মাধ্যমে এক সময় সরকার কম মূল্যে শঙ্খশিল্পীদের কাঁচামাল সরবরাহ করা হত। ২০০০ সালের গোড়ার দিকে শঙ্খশিল্পীগণ ডিআরডিএ থেকে ৫-১০ হাজার টাকা ঋণ পেয়েছিলেন, বর্তমানে তাও পান না। ৯১ বছরের শঙ্খশিল্পী জগন্নাথ পাল জানালেন, ১৩ বছর বয়স থেকে এ কাজ করছেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং নিজের পৈতৃক ভিটেতে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন কিন্তু কোনো সরকারি সাহায্য পান নি।

শারীরিক অসুস্থতাঃ দীর্ঘদিন শঙ্খশিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে পিঠের শিড়দাঁড়ার সমস্যা দেখা দেয়। কারণ কাজ বসে বসে করতে হয়। দেখা দেয় চোখের সমস্যা। দীর্ঘদিন কাজ করলে হাঁপানি রোগ দেখা দেয়। শাঁখের গুঁড়ো শ্বাসকষ্টের সম্ভাবনা তৈরি করে। শঙ্খ কাটার সময় অসাবধানে পা কাটলে প্রাথমিকভাবে গরম শাঁখের গুঁড়ো ব্যবহার করার চল ছিল। বিড়ি শ্রমিকদের যেমন সরকার থেকে অসুস্থতাজনিত সাহায্য করা হয় শঙ্খশিল্পীদের ক্ষেত্রে তা হয় না।

বর্তমান সমস্যাঃ শাঁখা শিল্পে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। আজ আর এই শিল্প ঔজ্জ্বল্যের চরমশিখরে নেই বলা চলে। আধুনিক প্রযুক্তির অবদানে এখন নানা ধরনের চুড়ি ও বালা তৈরি হচ্ছে, যা অতি অল্প মূল্যেই ক্রেতারা কিনতে পারছে। এই চুড়ি বা বলয় শাঁখার তুলনায় অনেক টেঁকসই এবং নয়ন মনোহর। ফলে আগে যারা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য শঙ্খবলয় পরিধান করত, আজ আর তারা পরিধান করে না। প্রায় শতবর্ষ পূর্বেই জেমস হরনেল লিখেছিলেন যে, বিলিতি বেলোয়ারি চুড়ি ও বিদেশী প্যাটার্নের গহনা প্রতি অনুরাগ বেড়ে যাবার কারণে বাঙালি ঘরের মেয়েরা শাঁখার প্রতি আকর্ষণ ক্রমেই হারিয়ে ফেলছে। সাম্প্রতিককালে এই প্রবণতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। অনেক আধুনিক শিক্ষিতা নারীই আর শঙ্খবলয় পরিধান করতে চায় না। শঙ্খবলয়ের পরিবর্তে বিদেশী চুড়ি বা অন্য অলঙ্কার পরিধান করতেই তারা বেশি আগ্রহী। আধুনিক নারীর রুচিবোধগত এই প্রবণতার ফলে শঙ্খশিল্পের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছে দারুণভাবে। বর্তমানে শাঁখারিদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ চালু হয়েছে। অনেক শাঁখারি নিজেদের মাঝে বিয়ে প্রথা পছন্দ করছে না। ফলে, এভাবেও শাঁখারিদের পূর্বপুরুষের দীর্ঘলালিত শঙ্খব্যবসা বিপন্নতার মুখে পড়ছে।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি (১৯৭৯) গ্রন্থে শাঁখের অলঙ্কার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। শঙ্খবলয় সৃষ্টি পৌরাণিক অনুষঙ্গের বিবরণ অমিয়কুমারের লেখা থেকে জানা যায়। শঙ্খশিল্পের বর্তমান দৈন্যদশার দুটি কারণ সনাক্ত করেছেন তিনি। তাঁর মতে— 'সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রধানত দুটি কারণে এ পেশার এখন ঘোর দুর্দিন। শঙ্খ উভয় বাংলার কোথাও উৎপন্ন হয় না। কয়েক স্তরে বিভক্ত মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের মারফত দক্ষিণভারত থেকে আমদানি করতে হয় বলে চাহিদার তুলনায় তার জোগান সর্বদাই দুর্মূল্য এবং অপ্রতুল। দ্বিতীয়ত, নব্যশিক্ষিত ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিবাহিতা মহিলাদের কাছে শাঁখা পরাটা আজকাল যেন কল্পিত আভিজাত্যের পরিপন্থী এক কুরুচির সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।'[১৩]

তথ্যসূত্রঞ্জ

১। James Hornell, 'The Chank-Bengalee Industry: Its antiquity and present condition' Memoirs of Asiatic Society Journal, Vol.3, Calcutta, 1912, p. 408.

২। অনিরুদ্ধ রায়, মধ্যযুগের ভারতীয় শহর, ইতিহাস গ্রন্থমালা—৭, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৯। পৃ. ১৫৫।

৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫

৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫।

৫। শিপ্রা সরকার, শঙ্খশিল্প (ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক মনোগ্রাফ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৬।

৬। James Hornell, পৃ. ৪০৮।

৭। দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ, ১৩৪১ প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪১২, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৯২৫।

৮। সুনীতিকুমার মণ্ডল, মুর্শিদাবাদের কাঁসা-পিতল শিল্পঃ অতীত-বর্তমান, উৎস মানুষ, ৩১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ. ১৩।

৯। দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ. ৯২৯।

১০। James Hornell, প. ৪৩৬

১১। অংশুমান রায়, শঙ্খশিল্প, (সম্পাদনা রবিন বিশ্বাস), ঝড় সাহিত্য পত্রিকা, বিষয়ঃ মুর্শিদাবাদ, দ্বিতীয় সংকলন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ২০০৪, পৃ. ৩৪৬।

১২। বিধান বিশ্বাস, শঙ্খনগরের কথা, পুরলোক বার্তা বিশেষ সংখ্যা, লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় লোকশিল্প, তারাপদ সাঁতরা প্রত্নশালা, গ্রন্থাগার ও লিটল ম্যাগাজিন আর্কাইভ ক্রিয়েটিভ স্টুডিও, গোপালমাঠ, দুর্গপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পৃ. ১৩৯।

১৩। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৯, পৃ. ৪৫।

(এই প্রবন্ধ রচনার তথ্য সংগ্রহে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য জিৎপুরের বিশ্বনাথ পাল, তমেশ পাল, দেবাশিস পাল এবং বাজিৎপুরের শঙ্কর পাল, নিতাই পালের কাছে আমি কৃতজ্ঞ)

উমা

সাঁওতালি ভাষার নির্দিষ্ট ছাঁদ চাই

অনুরূপা মুখোপাধ্যায়

'আদিবাসীরাই ভারতের প্রকৃত স্বদেশী বা প্রাচীনতম অধিবাসী, তাদের কাছে আর সকলেই বিদেশী। এই প্রাচীন জাতির নৈতিক দাবী ও অধিকার হাজার হাজার বছরের পুরানো।'

কথাটা একেবারেই সত্যি হলেও দুঃখের বিষয় ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতের ইতিহাস আজ পর্যন্ত আদিবাসীদের এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের ইতিহাসকেও স্বীকৃতি দেয় নি। এই বাস্তব সত্যটাকে স্বীকার না করে উপায় নেই। এইরকমভাবে স্বীকার করতে হবে যে, সাঁওতালি ভাষার মতো একটি ঐতিহ্যময়, প্রাচীন, সংবিধান স্বীকৃত ভাষার মান্যীকরণ এখনও সম্ভবপর হয় নি।

যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার ও উচ্চারণগত বহু রকমের অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকে। যেমন— বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কলকাতা ও নদীয়ার প্রচলিত কথ্যভাষার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার কথ্যভাষার উচ্চারণের ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। স্বভাবতই জীবিকার খোঁজে সাঁওতালরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছেন। আবার বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু আর সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের কথাবার্তায় বেশ কিছু পার্থক্য ধরা পড়ে। সাঁওতালি ভাষার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

কিন্তু আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার ও উচ্চারণগত বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে যে রকম প্রধানত নবদ্বীপ, শান্তিপুর অঞ্চলে ব্যবহৃত ও উচ্চারিত বাংলা শব্দই প্রাধান্য পেয়েছে; সাঁওতালি ভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটে নি। ভাষার ক্ষেত্রে লিখিত সাহিত্যের মধ্যে সংহতি থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সাঁওতালি ভাষার বিকাশের প্রধান অন্তরায় হল লিখিত সাহিত্যেব মধ্যে সংহতির অভাব।

সাঁওতালরা দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতের প্রধানত পাঁচটি রাজ্যে বসবাস করছেন। স্বাভাবিক কারণে সাঁওতালি ভাষায় আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালিতে বাংলা ভাষার প্রভাব, বিহার ও ঝাড়খণ্ডে হিন্দির প্রভাব, উড়িষ্যায় ওড়িয়া ভাষার প্রভাব ও আসামে অসমিয়া ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমদিকে সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার হার সেভাবে প্রসারিত না হওয়ার ফলে স্বভাবতই তাঁরা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং সাঁওতালি ভাষা নিয়ে মৌলিক চিন্তাভাবনাও সেভাবে হয় নি। এই প্রাদেশিক ভাষা নির্ভরতা এখনও সাঁওতালদের মধ্যে সমভাবে বর্তমান। এক একটি ভাষা এক একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব প্রকাশ মাধ্যম। কিন্তু এক একটি ভাষা সম্প্রদায় যে ভাষার মাধ্যমে ভাববিনিময় করে, সেই ভাষারও রূপ সর্বত্র সম্পূর্ণ একরকম নয়। যেমন— পূর্ববাংলা (বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমবাংলায় বাংলা ভাষাই প্রচলিত, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার উচ্চারণ ও ভাষারীতি পুরোপুরি একরকম নয়। একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক পার্থক্য, একে বলে আঞ্চলিক উপভাষা। উপভাষার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— 'A specific form of a given language, spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard or literary form of that language, as to pronunciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a district entity, yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as different language.'

অর্থাৎ একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পৃথক রূপকে উপভাষা বলে। তবে ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্যটি চূড়ান্ত নয়, আপেক্ষিক। এই আপেক্ষিকতার কথা মনে রেখেও কেউ কেউ বলেছেন— 'একই ভাষাভাষী এলাকার অন্তর্গত একাধিক অঞ্চলের ভাষার আঞ্চলিক রূপের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত পারস্পরিক বোধগম্যতা (mutual intelligibility) থাকে ততদিন ঐ আঞ্চলিক রূপগুলিকে বলা হবে উপভাষা (Dialect)।' সাধারণত দেখা যায়, ভাষা একটি বৃহৎ অঞ্চলে প্রচলিত, উপভাষা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলে।

অঞ্চল ভেদে একই ভাষার মধ্যে পার্থক্য হওয়ার ফলে ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদ প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় Attic-Ionic, Arcadian-Cyprian, Aeolic, Doric প্রভৃতি আঞ্চলিক উপভাষা ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাতেই আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠেছিল— 'উদীচ্য', 'মধ্যদেশীয়' ও 'প্রাচ্য'। পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ইংরেজির দুই প্রধান রূপ— ব্রিটিশ ও আমেরিকান। জার্মান ভাষায় আঞ্চলিক পার্থক্য খুব বেশি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় সব ভাষায়ই রয়েছে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য— আঞ্চলিক উপভাষা। অস্ট্রিক বংশজাত সাঁওতালি ভাষায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি। সাঁওতালি ভাষার প্রধান দুটি উপভাষা (Dialect) রয়েছে— (১) Southern dialect বা দক্ষিণ সাঁওতালি রূপ। (২) Northern dialect বা উত্তর সাঁওতালি রূপ।

Compbell তাঁর 'Santali - English Dictionary-তে উল্লেখ করেছেন যে, সাঁওতালি ভাষার দুটি উপভাষা আছে এবং তাদের নামকরণ করেছেন Southern এবং Northern dialects।

যদিও R.N.Cust সাঁওতালি ভাষার চারটি উপভাষার কথা উল্লেখ করেছেন এবং পরে তিনি স্বীকার করেছেন, এই চারটি উপভাষার সম্ভাব্যতা বাস্তবে নেই। কারণ, সাঁওতালি ভাষার এই চারটি উপভাষার অস্তিত্বকে তিনি প্রামাণ্য বলে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি এবং এখনও পর্যন্ত তা প্রমাণিতও হয় নি। সাঁওতাল মানুষজনেরা বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও অধিক পরিমাণে বসবাস করে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলা, উড়িষ্যায় ময়ূরভঞ্জ জেলায় ব্যবহৃত সাঁওতালি শব্দ, শব্দের উচ্চারণ এবং প্রচলিত শব্দের অর্থের সঙ্গে পার্থক্য দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বীরভূম, বর্ধমান (উত্তর), মুর্শিদাবাদ, মালদা জেলা এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে ব্যবহৃত সাঁওতালি শব্দের উচ্চারণ, ব্যবহৃত শব্দ ও অর্থের মধ্যে। সাঁওতালি ভাষার মান্য উপভাষা নির্ণয় সম্পর্কিত এই ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে ক্যাম্পবেলের দ্বারা উল্লিখিত সাঁওতালি ভাষার দুটি উপভাষা সাদার্ন এবং নর্দার্ন ডায়ালেক্ট-এর নিশ্চিত সন্ধান মিলেছে। সাঁওতালি ভাষার দুটি প্রধান উপভাষা ও সেগুলির অবস্থান দেওয়া হল।

সাদার্ন ডায়ালেক্ট বা দক্ষিণ সাঁওতালি রূপ পশ্চিমবঙ্গ (বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া), উড়িষ্যা (ময়ূরভঞ্জ)। নর্দার্ন ডায়ালেক্ট বা উত্তর সাঁওতালি রূপ পশ্চিমবঙ্গ (বর্ধমান-উত্তর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা)। ঝাড়খণ্ড (সাঁওতাল পরগনা)।

যেহেতু সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিভিন্ন রাজ্যে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করেন সেহেতু বিভিন্ন অঞ্চলের

সাঁওতালি ভাষার রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দভাণ্ডারের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষার সংস্পর্শে আসার ফলে সাঁওতালি ভাষার মধ্যেও অনেক শব্দগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। যেমন— আসাম ও নেপালের কথা ধরা যাক। আসামে যেমন অসমিয়া ভাষার প্রভাবজনিত কারণে সাঁওতালি শব্দের উচ্চারণ, শব্দগত অর্থ এবং কিছু কিছু সাঁওতালি শব্দও পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তেমনি নেপালেও নেপালি ভাষার প্রভাবে সেখানে প্রচলিত সাঁওতালি শব্দগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এইভাবে সাঁওতালি উপভাষাজনিত সমস্যা ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে। কারণ, এখনও পর্যন্ত সাঁওতালি মান্য উপভাষা কোনটি, সে সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। কিছু উচ্চারণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। যেমন--- আতো (N)—আতু (S) (গ্রাম); দারে (N) — দারি (S) (গাছ); হাকো (N) — হাকু (S) (মাছ); সেরেঞ (N) — সিরিঞ (S) (গান); আয়ো (N) — আয়ু (S) (মা); বেলে (N) — বিলি (S) (ডিম); ওনা (N) — অনা (S) (ঐটা); ওকা (N) — অকা (S) (কি)।

এই ধরনের অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হল, কোন রূপটি মান্য সাঁওতালি হিসাবে বিবেচনাযোগ্য? বাংলা 'তুমি' সাঁওতালিতে 'আম', 'আপনি' অর্থে সাঁওতালিরা 'আবিন/আবেন' শব্দের ব্যবহার করেন। আবার 'আবিন/আবেন' শব্দ বিশেষ সম্পর্কের আত্মীয়দের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে সাঁওতালি ভাষার নির্দিষ্ট অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। নর্দার্ন রিজিয়ন-এর সাঁওতাল মানুষজনেরা সাদার্ন রিজিয়ন-এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য কোনমতেই গ্রহণ করতে সম্মত নয় এবং একইভাবে সাদার্ন রিজিয়ন-এর সাঁওতালরাও তাঁদের নিজস্ব উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকেই ধরে রাখার পক্ষপাতী। সুতরাং সাঁওতালি ভাষার মান্যরূপ নির্ধারণ করাটা খুবই জরুরি ও প্রাসঙ্গিক একটি প্রসঙ্গ।

এর ফলস্বরূপ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে যে সমস্ত সাঁওতালি পুস্তক, পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলি পর্যালোচনা করতে দেখা যায়, সেগুলিতে ব্যবহৃত শব্দ ও উচ্চারণ মোটেই এক ধরনের নয়। ফলে সাঁওতালি লিখিত সাহিত্যের মধ্যে ভাষার সংহতি ও গুণমান নিয়ে সাঁওতাল সাহিত্যিকেরা দ্বিধার মধ্যে আছেন। এই দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় সাঁওতালি ভাষার মান্যীকরণ কতটা প্রাসঙ্গিক বিষয়। কারণ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এই প্রকার শব্দ বা বাক্য গঠনের শৈলী ব্যবহার করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি উল্লেখ্য বিষয় হল, সাঁওতালি ভাষার জীবন্ত সমস্যা হল লিপি সমস্যা। কারণ কোনও ভাষার মান্যীকরণ করতে হলে প্রথমেই দেখা দরকার যে সেই ভাষার মান্যলিপি আছে কিনা। সাঁওতালি ভাষার ট্রাজেডি এই যে, প্রায় পাঁচটি লিপির দ্বারা বিচ্ছিন্ন এই ভাষাগোষ্ঠী। বিহার ও ঝাড়খণ্ডে সাঁওতালি চর্চা হয় রোমান ও দেবনাগরী লিপিতে, বাংলায় বাংলা ও অলচিকি লিপিতে, উড়িষ্যায় ওড়িয়া ও অলচিকিতে, আসামে অসমিয়া ও অলচিকি লিপিতে লেখা হয় সাঁওতালি ভাষা। ফলে নানা প্রান্তের সাঁওতাল রাজনৈতিক কারণে প্রাদেশিক সরকার একাধিক লিপিকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন, এর ফলে যে বাস্তব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তা হল বিভিন্ন প্রান্তের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, ভাবের আদান-প্রদান হচ্ছে না।

বর্তমানে বর্ধমান ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনেক কলেজে সাঁওতালি স্নাতক স্তরের পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে। ফলে সাঁওতালি শিক্ষার্থীরা বুঝে উঠতে পারছে না যে, কোন শব্দ বা কোন লিপি তাঁরা ব্যবহার করবেন। মান্য শব্দ বা মান্য লিপি নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংশয় দেখা দিচ্ছে। এইভাবে সাঁওতালি লিখিত সাহিত্যের মধ্যে ব্যবহারিক সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে। শব্দগত, উচ্চারণগত প্রভেদের জন্য সাঁওতালি ভাষার সমন্বয় সম্ভব হয় নি। ফলে সাহিত্যের ভাষাও গড়ে ওঠে নি।

এই সমস্যার সমাধান হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। বিশেষ করে লিখিত সাহিত্যের জন্য প্রয়োজন মান্য লিপি ও মান্য ভাষার। কারণ ভাষাগত সংহতি বজায় না থাকলে লিখিত সাহিত্যের গুণমান নিয়ে সংশয় থেকে যায়। সুতরাং সাঁওতালি ভাষার নির্দিষ্ট মাপকাঠি তৈরি হলে সমগ্র সাঁওতাল সমাজ উপকৃত হবে। শুধু শিক্ষার্থীরাই নয়, সাঁওতাল লেখকগণ, পত্রপত্রিকার সম্পাদকগণ থেকে শুরু করে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও সাঁওতালি ভাষার মান্যীকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া সাঁওতালি লিখিত রূপ থেকে কথ্য সাঁওতালি ভাষাতেও মান্যরূপের প্রভাব পড়বে। যেমন— বাংলা ভাষায় হয়েছে। সব থেকে বড় কথা হল, সাঁওতালি ভাষার মান্যীকরণ হলে বিভিন্ন প্রান্তের সাঁওতাল গোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাকেন্দ্রিক বিরোধ মিটে যাবে, তাঁরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ পাবেন, উন্মোচিত হবে সাঁওতালি ভাষা জগতে একটা নতুন দিগন্তের।

উমা

চিকিৎসায় মানবিক মুখ চাই

প্রিয় সম্পাদক
উৎস মানুষ,

'উৎস মানুষ' এপ্রিল-জুন (২০১৭) সংখ্যায় গৌতম মিস্ত্রীর লেখা 'চিকিৎসা পরিষেবায় পারদর্শিতা' লেখাটি পড়ে আমি অভিভূত। প্রথম, লেখাটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছে, দ্বিতীয়ত, লেখকের লেখার মুনশিয়ানা প্রশংসার দাবি রাখে।

আমাদের মতো যারা চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়টিতে একেবারেই অজ্ঞ অথচ অসুখবিসুখ হলেই খুঁজে ফিরি কোথায় সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা পাব, তাদের চোখে আঙুল দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে, চিকিৎসার নামে আমাদের দেশে কী চলছে। দেশের বেশিরভাগ মানুষ আর্থিক দিক দিয়ে যথেষ্ট দুর্বল, আর অন্যদিকে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের অজ্ঞতাও সীমাহীন। অথচ বাড়ির কোনও প্রিয়জনকে বুকের ব্যথায় যখন কষ্ট পেতে দেখেন, তখন দিশেহারা হয়ে তাঁরা ছুটে বেড়ান কোথায় গেলে ব্যথার উপশম হবে, রুগী আরাম পাবে। কিন্তু কোথাও কিছু না পেয়ে অবশেষে নার্সিং হোমের দরজায় কড়া নাড়তে বাধ্য হন। আর যে নার্সিংহোম যত বেশি ঝাঁ চকচকে, তাদের খাঁইও তত বেশি। রুগীর বাড়ির লোকের ব্যাকুলতাই হল এইসব নার্সিংহোমের বিল তৈরির মাপকাঠি। আর আমাদের মতো মানুষজন, যারা চোখ থাকতেও অন্ধ, কান থাকতেও বধির, তারা তো বটেই, আর একেবারে অশিক্ষিত বাড়ির লোকেরা নার্সিংহোমের দাবির যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দেন। এইভাবেই চলছে আমাদের দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা।

কিন্তু গোটা চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে যেটা মূল দরকার তা হল রোগী ও তাঁর বাড়ির লোকের সামনে কয়েকটি মানবিক মুখের উপস্থিতি। অর্থাৎ যন্ত্রণাকাতর রোগী আর তাঁর বাড়ির লোকজন যখন ডাক্তারবাবুর কাছে আসেন, তখন ডাক্তারবাবু যদি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে রোগীকে আশ্বাস দেন কিছু হয় নি, ওষুধ খেলে সেরে যাবে, আমার মনে হয়, রোগী অনেকটা সুস্থ তখনই হয়ে যান।

চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে এই মানবিকতার গুরুত্ব তাঁর লেখার মধ্যে তুলে ধরার জন্য লেখক গৌতমবাবুকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ।

পূরবী ঘোষ, বালি

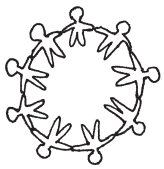

সংগঠন সংবাদ

কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারঙ্ক সারা বছরই নানা কর্মকাণ্ড চালায়। স্থানীয় জলাভূমি বাঁচানো থেকে কালীপুজোয় শব্দবাজির বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালায়। আলোচনার আয়োজন করে। তারা এবার বার্ষিক মিলনসভার আয়োজন করেছে ২২ অক্টোবর, রবিবার, বিকেল ৩টেয়। বসন্তবাবু রোডের অ্যালব্যাট্রস স্কুলে। আলোচ্যঙ্ক কী করি, কেন করি।

ভবাদীঘি বাঁচুক, রেলপথ হোক, বাঁচুক পশ্চিমবঙ্গের জলাভূমি– এই আওয়াজ তুলে বিজ্ঞান সংগঠনগুলোর যৌথ কমিটি এক ব্যানার, পোস্টার নিয়ে প্রচার অভিযান চালাবে চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে। বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা। ১ নভেম্বর, বুধবার।

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 20.00
৩৭ বর্ষ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭ ২০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা পেতে যোগাযোগ করুন
সুমন্ত বিশ্বাস
২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা - ৭০০০১২
(কলেজ স্ট্রীট কর্পোরেশন অফিসের পাশের গলি)
ফোন নং - ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪

উৎস মানুষ-এর সমস্ত বই-এর জন্য
যোগাযোগ করুন
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩, বেনিয়াটোলা লেন।
কলকাতা -৭০০০০৯
ফোন - ২২৪১-৬৯৮৮

উৎস মানুষ পত্রিকার গ্রাহক হবার নিয়ম

বছরে ৪টি সংখ্যা। চাঁদা ডাক খরচ সহ ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। UBI-এর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিন অথবা অন্য যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা জমা দিন UBI কলেজ স্ট্রীট শাখায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

United Bank of India, College Street Branch, Kolkata - 700073. UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. UTBI0COLI08

ফোন করে কিংবা ই-মেল করে আপনার ঠিকানা (পিনকোড ও ফোন নং সহ) এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক হলেন অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। বইমেলার স্টলে গ্রাহক করা হয়। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা হয়। ডাকে পত্রিকা পাঠানো হবে।

ওয়েবসাইট ঃ www.utsamanush.com
ই-মেল ঃ utsamanush1980@gmail.com

পুস্তক তালিকা

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (দুই খণ্ড একত্রে সংকলিত)	২০০.০০
গুমোট ভাঙ্গার গান	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি	৫০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ	১৫০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক	১৮.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু	৪০.০০
এটা কী ওটা কেন	৫০.০০
যে গল্পের শেষ নেই	৫০.০০
আরজ আলী মাতুব্বর	২০.০০
প্রতিরোধঃ অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে	৬০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	১০০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি	৬০.০০
প্রমিথিউসের পথে	৪০.০০
লেখালিখি	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	৪০.০০
মূল্যবোধ	৫০.০০

প্রাপ্তিস্থানঃ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট)।

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদকঃ সমীরকুমার ঘোষ